রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একাদশ ভাগ — ১ম—৪র্থ সংখ্যা

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, পত্রিকাধ্যক্ষ।

রঙ্গপুর

(রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়
কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন সহকারীসম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত)

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী)

সূচী

কলিকাতা
৯, বিশ্বকোষ-লেন, বাগবাজার,
বিশ্বকোষ প্রেসে
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্রদ্বারা মুদ্রিত।
১৩২৩ বঙ্গাব্দ

বার্ষিক মূল্য ৩ ্ টাকা।] [ডাকমাশুল ।৵০ আনা

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে
এই পত্রিকা পাইবেন।

☞ কোনও সদস্যের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে অগৌণে জানাইবেন।

নিবেদন

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের পরলোকগত সদস্য নাওডাঙ্গা নিবাসী পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশের নাম রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দের অনেকেই অবগত আছেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে পরিষদের অধিকাংশ হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত ইহার নাম বিজড়িত আছে। ইহার সুলিখিত প্রবন্ধরাজি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুস্তক ও পুঁথি, মূর্ত্তি ও তাম্রমুদ্রাদি সংগ্রহ দ্বারাও পূর্ণেন্দুবাবু পরিষদের গৌরব-বর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষদের হিতানুষ্ঠানকল্পে পূর্ণেন্দুবাবু যাহা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের বিগত ত্রয়োদশ বার্ষিক দ্বিতীয় অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য-বৃন্দ পূর্ণেন্দুবাবুর নিঃস্বপরিবারবর্গের জন্য অর্থ-সংগ্রহ-কল্পে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি এতদর্থে যাহা কিছু সাহায্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ প্রকাশে যথাসম্ভব সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলে বাধিত হইব। অতি ক্ষুদ্র দানও সাদরে গৃহীত হইবে ইতি।

বশংবদ

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক

রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ।

রঙ্গপুর-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী।

১। চণ্ডিকাবিজয়। (মহাকাব্য)

রঙ্গপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন কৃত শক্তিবিষয়ক আদিগ্রন্থ।

ডিমাই ৮ পেজী আকারের প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ উপাদেয় সটীক গ্রন্থের অর্দ্ধমূল্য—কাগজের মলাট ৷৷০ আনা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই করা ৷৷৶০ আনা।

২। আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম্, এ মহাশয় সম্পাদিত। সভ্যেতর ব্যক্তিগণের পক্ষে মূল্য ৷৷০ আনা।

৩। গৌড়ের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। (হিন্দুরাজত্ব)

মালদহের সুযোগ্য পণ্ডিত ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সঙ্কলিত এই ইতিহাসগ্রন্থ সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য কাগজের মলাট ৷৷৶০ এবং সুন্দর বাঁধাই করা ১৲ টাকা।

৪। বগুড়া—সেরপুরের ইতিহাস।

বঙ্গের সুলেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

৫। বগুড়ার ইতিহাস। (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয় রচিত এই গ্রন্থে সমগ্র বগুড়ার যাবতীয় বিবরণ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷৶০ ও ১৷০, এই সভার সভ্যগণের পক্ষে ৷৶০ ও ৷৷৶০ আনা মাত্র।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দশম ভাগ

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

রঙ্গপুর

১৩২৩ বঙ্গাব্দ

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

কলিকাতা

৯, বিশ্বকোষ-লেন, বাগ্‌বাজার,
বিশ্বকোষ-প্রেসে,
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্রদ্বারা মুদ্রিত।

দশম ভাগের সুচী

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—সম্মিলন-সংখ্যা

[নবম উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের রঙ্গপুর অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী]

পাণ্ডুনগরে শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের অভ্যুদয়ের কালনির্ণয়

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দনদেবের অভ্যুদয়কাল ও বংশ সম্বন্ধে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, মালদহের স্বনামখ্যাত পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের প্রাপ্ত 'শ্রীশ্রী-মহেন্দ্রদেব' নামাঙ্কিত একটী ও 'শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দনদেব' নামাঙ্কিত একটি, ও 'যশোর-খুলনার ইতিহাস-লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রাপ্ত একটি—এই তিনটী রজত-মুদ্রা আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে উক্ত সমস্যা অনেকটা সহজ ও সমাধানযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি পাণ্ডুনগরাধিপ শ্রীশ্রীমহেন্দ্রদেব নামক রাজার শাসনকাল ও দনুজমর্দ্দন-দেবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ-বিচার লইয়া অপর একটি গুরুতর নূতন সমস্যা আমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'দেববংশম্' নামক একখানি নবাবিষ্কৃত কুলগ্রন্থ এবং প্রসিদ্ধ প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট ঢাকা বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত H. E. Stapleton সাহেবের নিকট অবস্থিত মহেন্দ্রদেব নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রা এই সমস্যাটিকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে।

রাধেশবাবুর প্রাপ্ত মুদ্রাদ্বয়ের একটির প্রথম পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীমহেন্দ্রদেবস্য" ও অপর পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ—পাণ্ডুনগর—শকাব্দা •৩৩•" এবং অপর মুদ্রাটির প্রথম পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দনদেব" ও অপর পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ—পাণ্ডুনগর—শকাব্দা • • ৩৯" খুব পরিষ্কারভাবে খোদিত রহিয়াছে। মহেন্দ্রদেব নামাঙ্কিত মুদ্রাটির সহস্রক স্থানটি ক্ষয়-প্রাপ্ত ও একক স্থানটি অস্পষ্ট এবং দনুজমর্দ্দনদেব নামাঙ্কিত মুদ্রাটির মর্দ্দনের 'ন' অক্ষর ও শকাব্দের সহস্রক স্থানটি ক্ষয়প্রাপ্ত ও শতক স্থানটি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রাধেশবাবু কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাদ্বয় সাধারণের গোচরীভূত হইবার পর পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল পাণ্ডুনগর বা বর্ত্তমান হজরৎ পাণ্ডুয়া নামক স্থানে কোন সময়ে মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনদেব নামক ব্যক্তিদ্বয় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া নিজ নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনদেবের আবির্ভাব-কাল লইয়া ঐতিহাসিক মহলে নানাপ্রকার বাদানুবাদের সূত্রপাত হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় সতীশবাবুর প্রাপ্ত

মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐতিহাসিকগণ দনুজমর্দ্দনদেবের সময় ও সেনবংশীয় দনৌজামাধব বা দনুজরায়ের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ না থাকা সম্বন্ধে একরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে এক অভিনব সমস্যার উৎপত্তি হইল। সতীশবাবুর প্রাপ্ত মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দনদেব—১৩৩৯ শকাব্দা—চন্দ্র(দ্বী)প" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ" কথাগুলি অতি স্পষ্টভাবে অঙ্কিত ছিল। সুতরাং রাধেশবাবুর প্রাপ্ত মুদ্রার শকাব্দ সংখ্যার শতক ও সহস্রক স্থান যে যথাক্রমে "৩" ও "১" এবং পূর্ণ শকাব্দ সংখ্যা যে "১৩৩৯" তাহা অনুমান করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইল না। কিন্তু সতীশবাবুর মুদ্রাটি "চন্দ্রদ্বীপ" হইতে মুদ্রিত হওয়ার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া নানাজনে নানাপ্রকার কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমান ঐ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ একরূপ মানিয়া লইলেন। রাখাল বাবু 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁহার মত যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

" ... ... সমসুদ্দিন ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে [গৌড়] সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় উত্তরবঙ্গের ভাটুরিয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ বা কংস অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং বিদ্রোহী হইয়া মুসলমান রাজাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহার পর পাঁচ বৎসরকাল রাজধানী ফিরোজাবাদ অর্থাৎ পাণ্ডুনগরে সাহাবুদ্দিন বায়াজিদ্ সাহের নামে মুদ্রাঙ্কিত হইত। কেহ কেহ বলেন, পদচ্যুত রাজার পুত্র বায়াজিদ্ সাহকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নামে গণেশ বা কংস বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। অপরাপর ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, রাজা গণেশ বা কংস মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সাহাবুদ্দিন বায়াজিদ্ শাহ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বায়াজিদ্ শাহের পর রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জালালুদ্দিন শাহ মহম্মদ নাম গ্রহণ করেন ও ১৪১৪ হইতে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। যদুর রাজত্ব পূর্ব্বে মুয়জ্জমাবাদ [ময়মনসিংহ] ও চাটগাঁও [চট্টগ্রাম] ও দক্ষিণে সাতগাঁও [সপ্তগ্রাম] পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের নিম্নলিখিত টাঁকশালগুলিতে মুদ্রিত রৌপ্য মুদ্রা কলিকাতার যাদুঘরে আছে—(১) ফিরোজাবাদ [পাণ্ডুয়া বা পাণ্ডুনগর] (২) সাতগাঁও [সপ্তগ্রাম] (৩) মুয়জ্জমাবাদ [ময়মনসিংহ] (৪) ফতেহাবাদ [ফরিদপুর] (৫) চাটগাঁও [চট্টগ্রাম]।

"যে বৎসর রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণের মৃত্যু হয় সেই বৎসরেই মহেন্দ্রদেবের মুদ্রাটি [পাণ্ডুনগরে] প্রস্তুত হইয়াছিল। * * * * অনুমান হয় রাজা গণেশ বা কংস-নারায়ণের মৃত্যুর পর যদু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে মহেন্দ্রদেব বিদ্রোহী হইয়া পাণ্ডুনগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করেন। ইতিহাসে কথিত আছে, যদু পাণ্ডুনগর বা ফিরোজাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী পুনরায় গৌড়ে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহাও হইতে পারে যে, মহেন্দ্রদেবের ভয়ে যদুকে ফিরোজাবাদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

মহেন্দ্রদেব সম্ভবতঃ দনুজমর্দ্দনের পিতা। দনুজমর্দ্দনদেব সম্ভবতঃ পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াই যদু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছিলেন ও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পাণ্ডুনগরে ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে দনুজমর্দ্দনদেবের যে মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। দনুজমর্দ্দনদেবের রাজত্ব বরেন্দ্রভূমি হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল না—তাহার প্রধান কারণ এই যে, ১৩৩৯ শকাব্দে (১৪১৭—১৮ খৃঃ=৮২১ হিঃ) ফতেহাবাদ ও সাতগাঁও জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের হস্তগত ছিল, কারণ ঐ বৎসরে পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ে তাঁহার মুদ্রাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দনুজমর্দ্দনদেব বোধ হয় রাজ্যপ্রাপ্তির বৎসরেই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপন করিয়া স্বনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া হস্তচ্যুত হইলেও সাইফুদ্দিন বায়াজিদ্ শাহ ও জালালুদ্দিন মহম্মদ সাহের অনেক মুদ্রার খোদিত লিপিতে ফিরোজাবাদে খোদিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। হিঃ ৮১৬ হইতে ৮১৯ [১৪১৩—১৪১৬ খৃঃ] পর্য্যন্ত মুদ্রিত মুসলমান মুদ্রা ফিরোজাবাদে মুদ্রিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।" [প্রবাসী ১২শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৩৮৭—৩৮৮ পৃঃ]

উদ্ধৃত অংশে রাখালবাবু মহেন্দ্রদেবকে দনুজমর্দ্দনদেবের পিতা বলিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি "দেববংশম্" নামক বটুভট্টকৃত একখানি নবাবিষ্কৃত কুলগ্রন্থও তাঁহার ঐরূপ অনুমানের যাথার্থ্য সমর্থন করায় কেহ কেহ রাখালবাবুর উক্ত মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেছিলেন এবং ঐতিহাসিক বিষয়ে কুলশাস্ত্রের প্রমাণের প্রতিষ্ঠা খ্যাপনে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইতিমধ্যে রাখালবাবু তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রথম ভাগের ১৩১ পৃষ্ঠায় মহেন্দ্রদেব সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মত প্রত্যাহার করিয়া লিখিলেন—"স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার চিত্র দেখিয়া আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে, উক্ত মুদ্রা ১৩৩৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। ঢাকা-বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্টন্ (H. E. Stapleton) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত খুলনা জেলায় আবিষ্কৃত দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা দর্শন করিতে আসিয়া আমাকে মহেন্দ্রদেবের অনেকগুলি রজত মুদ্রা দেখাইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত মুদ্রা ১৩৪০ হইতে ১৩৪৯ শকাব্দের [১৪১৮—১৪২৭ খৃঃ] মধ্যে কোন সময়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। কারণ এই সকল মুদ্রার সহস্রাঙ্কের স্থানে ১, শতাঙ্কের স্থানে ৩, দশাঙ্কের স্থানে ৪ অঙ্কিত আছে। প্রায় সকল মুদ্রাতেই একাঙ্কের স্থান কাটিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডুয়ায় আবিষ্কৃত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রায় 'শকাব্দা ১৩৩৬' পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহেন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত মুদ্রা সমূহ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পাণ্ডুয়ার মুদ্রার তারিখের প্রকৃত পাঠোদ্ধার হয় নাই। ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ যে মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এখন কোথায় আছে বলিতে পারা যায় না। মূল মুদ্রা পরীক্ষা না করিয়া পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা উচিত নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে দনুজমর্দ্দনদেবের যে মুদ্রা রক্ষিত আছে, তাহাতে স্পষ্ট শকাব্দা ১৩৩৯ লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত

ষ্টেপল্‌টন্ মহেন্দ্রদেবের যে মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার তারিখের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে তিনি এবং আমি এক মত হইয়াছি। এই সকল মুদ্রা যে ১৪১৮ হইতে ১৪২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল নবাবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণীত হইতেছে যে মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনদেবের পরবর্ত্তী, পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। সুতরাং মহেন্দ্রদেবের সহিত যদি দনুজমর্দ্দনদেবের কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলেও তিনি দনুজমর্দ্দনদেবের পিতা হইতে পারেন না। সুতরাং বটুভট্টের 'দেব-বংশের' ঐতিহাসিক অংশগুলি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে না।"

রাখেশবাবুর আবিষ্কৃত মুদ্রাদ্বয় এক্ষণে আর প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। তিনি উক্ত উভয় মুদ্রার যে আলোক-চিত্রসহ বিবরণ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৭ সাল, ২য় সংখ্যা, ৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার তারিখের একক সংখ্যাটি তিনি "৬" বলিয়াই পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্রে একক স্থানের সংখ্যাটি নিতান্ত অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। তাহা '৬' না হইয়া '৯' হইলেও হইতে পারে। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু ষ্টেপল্‌টন্ সাহেবের নিকট মহেন্দ্রদেব নামাঙ্কিত যে সকল মুদ্রা দেখিয়াছেন, তাহাতে টাকশালের নাম ও 'চণ্ডীচরণপরায়ণ' কথাগুলি অঙ্কিত আছে কিনা জানিতে পারিলে আমাদের আলোচ্য মহেন্দ্রদেব ও ষ্টেপল্‌টন্ সাহেবের মুদ্রার 'মহেন্দ্রদেব' অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বুঝিবার সুবিধা হইত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে রাখালবাবু ঐ দুইটী প্রধান বিষয় সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই। ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা যে, রাজা দনুজমর্দ্দনদেবই চন্দ্রদ্বীপের "দেব"-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাহা হইলে [চণ্ডীচরণপরায়ণ] "দনুজমর্দ্দনদেবের" প্রথমতঃ পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়ায় ১৩৩৯ শকাব্দে অভ্যুদয় হয়, এবং তথা হইতে ঐ শকাব্দেই তিনি চন্দ্রদ্বীপে গিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন—তাঁহার পূর্ব্ববর্ণিত মুদ্রাদ্বয় হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয়—শ্রীযুক্ত রাখালবাবুও তাহাই অনুমান করিয়াছেন। এরূপ স্থলে পাণ্ডুনগরাধিপ [শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ] মহেন্দ্রদেবকে উক্ত দনুজমর্দ্দনদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কারণ তাঁহাদের মতে মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনদেবের পরবর্ত্তী হইলে তাঁহার মুদ্রায় 'পাণ্ডুনগর' অঙ্কিত না থাকিয়া 'চন্দ্রদ্বীপ'ই অঙ্কিত থাকিত। পাণ্ডুনগরে প্রাপ্ত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রায় ও দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রায় "পাণ্ডুনগর" এবং সুন্দরবনে প্রাপ্ত দনুজমর্দ্দন-দেবের মুদ্রায় "চন্দ্রদ্বীপ" অঙ্কিত থাকায় ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনদেব উভয়েই পাণ্ডুনগরে রাজত্ব করিতেন। অধিকন্তু, দনুজমর্দ্দনদেব পাণ্ডুনগর হইতে চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া নূতন রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দনদেব উভয়েই পাণ্ডুনগরে রাজত্ব করিয়া থাকিলে, উভয়ে যে একই সময়ে তথায় রাজত্ব করেন নাই, একজন অপরের পরে রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এরূপ স্থলে রাখালবাবুর মুদ্রার সাক্ষ্য ঠিক হইলে, অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, ১৩৩৯ শকাব্দে দনুজমর্দ্দনদেব পাণ্ডুনগর

অধিকার করিবার পর তিনি মহেন্দ্রদেব কর্ত্তৃক ঐ শকাব্দেই পাণ্ডুনগর হইতে বিতাড়িত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং মহেন্দ্রদেব ১৩৩৯ শকাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৪০ হইতে ১৩৪৯ শকাব্দ মধ্যে যে কোন সময় পর্য্যন্ত পাণ্ডুনগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, হিঃ ৮১৬ হইতে ৮১৯ (১৪১৩—১৪১৬ খৃঃ=১৩৩৫—১৩৩৮ শকাব্দ) পর্য্যন্ত কতকগুলি মুদ্রা ফিরোজাবাদে মুদ্রিত হইয়াছে—তন্মধ্যে কতক সাহাবুদ্দিন বায়াজিদ্ শাহ ও কতক জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের নামাঙ্কিত। রাখালবাবুর মতে ঐ সময় (১৪১৩—১৬ খৃঃ) পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া জালালুদ্দিনের হস্তচ্যুত হইলেও তিনি তাঁহার মুদ্রায় ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া) নামযুক্ত মোহরাঙ্কিত করাইতেন। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত ধরিয়া লইলে এরূপ অসঙ্গত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। কারণ ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া) হস্তচ্যুত হইবার পরে ঐ নগরের নামসংযুক্ত মুদ্রা প্রকাশ করা কোন রাজার পক্ষেই গৌরবের বিষয় হইতে পারে না, এবং এরূপ ঘটনা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। আমাদের বোধ হয় রাখালবাবু মহেন্দ্রদেবের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই ঠিক, অর্থাৎ মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনদেবের পরবর্ত্তী। সম্ভবতঃ [যদু] জালালুদ্দিন মহম্মদশাহ ১৪১৬ খৃষ্টাব্দ (১৩৩৮ শকাব্দ) পর্য্যন্ত পাণ্ডুনগরে [ফিরোজাবাদে] নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করেন এবং তথা হইতে মুদ্রা প্রচার করেন। এই জন্যই ঐ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার মুদ্রিত মুদ্রায় ফিরোজাবাদের (পাণ্ডুয়া) নাম অঙ্কিত দেখা যায়। তৎপর ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে (১৩৩৯ শকাব্দে) দনুজমর্দ্দনদেব জালালুদ্দিনকে বিতাড়িত করিয়া পাণ্ডুনগর অধিকার করেন এবং তথা হইতে স্বনামে মুদ্রা প্রচার আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ দনুজমর্দ্দনদেব পাণ্ডুনগর হইতে তাড়িত হইয়া দলবল সহ চন্দ্রদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ঐ ১৩৩৯ শকাব্দেই তথায় নূতন স্বাধীন রাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতঃ স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনদেবের সহিত কিরূপ সম্পর্কান্বিত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তাঁহাদের তুল্য উপাধি ও উভয়ের মুদ্রায় "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ" মুদ্রিত থাকায় তাঁহাদিগকে এক বংশীয় বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক রাজা দনুজমর্দ্দনদেবই যে ১৩৩৯ শকাব্দে পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া হইতে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান শাসন পর্য্যুদস্ত করেন, এবং তৎপর ঐ শকাব্দেই তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া মহেন্দ্রদেব যে ১৩৩৯ শকাব্দ হইতে অন্ততঃ ১৩৪০ শকাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ডুনগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা রাধেশবাবুর প্রাপ্ত মুদ্রা ও রাখালবাবুর উল্লিখিত মুদ্রার প্রমাণ হইতে সঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এস্থলে ইহা বলিয়া রাখা উচিত যে, যদি রাখালবাবুর মুদ্রার মহেন্দ্রদেব ও রাধেশবাবুর মুদ্রার মহেন্দ্রদেব এক ব্যক্তি না হন, তবে বটুভট্টের কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন।

প্রাচীন ভারতের রণ-প্রসঙ্গ

চমূ

প্রাচীন ভারতে রাজশক্তি ছয় প্রকারে বিভক্ত ছিল। (১) দৈহিক শক্তি, (২) বীরভাব, (৩) সৈন্যবল, (৪) অস্ত্রশস্ত্র, (৫) বুদ্ধিমত্বা (৬) ও দীর্ঘায়ু। বর্ত্তমানেও উল্লিখিত গুণাবলির আবশ্যকতা যে পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইতেছে, রাজার দৈহিক বলের আবশ্যকতা সে হিসাবে বড় দৃষ্ট হইতেছে না। প্রাচীনকালেও বর্ত্তমানের ন্যায় চমূ, নিজ সৈন্য ও মিত্রসৈন্যরূপে দুই ভাবে বিভক্ত হইত। শুক্রাচার্য্য, রাজার স্বকীয় সৈন্যকে মূল ও সপ্তস্ক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। রাজার অধীনে দীর্ঘকালব্যাপী সৈনিক কার্য্যে লিপ্ত যোদ্ধাকে মূল ও স্বল্পকালব্যাপী সৈনিক কার্য্যে লিপ্ত যোদ্ধাকে সপ্তস্ক নামে অভিহিত করা হইত। বর্ত্তমানেও প্রতি রাজ্যেই স্থায়ী সৈন্য (Standing army) ও আপদ্‌কালে বা নিজ রাজ্য শত্রু আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার সময়ে সপ্তস্ক (Militia) সৈন্য গ্রহণের বিধি আছে। সপ্তস্ক সৈন্য কেবল দেশ হইতেই সংগ্রহ হইত তাহা নহে, ইহাতে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সৈন্যও থাকিত এবং শত্রুপক্ষবর্জ্জনকারী সৈন্যদলও ইহাতে স্থান পাইত। পরন্তু গুপ্তচর দ্বারা শত্রু সৈন্যকে নিজ দলে ভুক্ত করার বন্দোবস্ত ছিল।

কামন্দকীয় অর্থশাস্ত্রে রাজার সৈন্যবল ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) মূল বা দীর্ঘকালস্থায়ী সৈন্যদল, (২) বেতনভুক্ সৈন্যদল, (৩) শ্রেণী সৈন্য, (৪) মিত্র সৈন্য, (৫) শত্রুপক্ষপরিত্যাগকারী সৈন্যদল (৬) এবং পার্ব্বত্য জাতি। রাজা মূল সৈন্যের উপরই পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতেন। শুক্রনীতিতে উল্লেখ আছে, মূলসৈন্য কখনও নিজ রাজপক্ষ পরিত্যাগ করে না। অপর বেতনভুক্ সৈন্যদলের রক্ষণ ও ভরণপোষণের ভার রাজা বহন করিতেন, এবং তাহাদের পরিবারবর্গ রাজতত্বাবধানে থাকিত। শ্রেণীসৈন্য সময়োপযোগী আবশ্যকতার জন্য সংগ্রহ করা হইত। ইহারা তত শিক্ষিত নহে। ইহাদিগকে নিজ বশে রাখিবার জন্য যথাসময়ে তাহাদের প্রাপ্য বেতন দান করা হইত। পার্ব্বত্যজাতিকে রাজা প্রায়ই বিশ্বাস করিতেন না; উহাদিগকে স্বভাবতঃই অবিশ্বাসী, অর্থলোভী এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সাধারণতঃ রাজসৈন্য পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথী এই অত্যাবশ্যকীয় চতুরঙ্গ বলে বিভক্ত থাকিত। আহতদিগকে রণক্ষেত্র হইতে শিবিরে স্থানান্তরিত করিবার জন্য শুশ্রূষাকারী লোকের বন্দোবস্ত ছিল। খাদ্যদ্রব্য অস্ত্রশস্ত্র বহনের নিমিত্ত হস্তী প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। প্রতি অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে ২১৮৭০টী হস্তী, ২১৮৭০ খানি রথ, ৬৫৬১০টী অশ্ব এবং ১০৯৩৫০ জন পদাতিক সৈন্য থাকিত। প্রাচীন ভারতে যুদ্ধে

হস্তীর স্থান অতি উচ্চে ছিল। কামন্দকীয় অর্থনীতিতে আছে, উপযুক্ত মাহুত পরিচালিত যুদ্ধে অভ্যস্ত একটী হস্তী ৬০০০ অশ্ব বিনাশে সমর্থ। বর্ত্তমানে রণক্ষেত্রে হস্তীর ব্যবহার এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে।

পদাতিকগণ সাধারণতঃ রাস্তা পরিষ্কার রাখিত, সংবাদ চলাচলের সুবন্দোবস্ত করিত, রণলিপ্ত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রাদির সরবরাহ করিত এবং আহতদিগকে রণস্থল হইতে নিরাপদ স্থানে আনয়ন করিত। পদাতিক সৈন্যের অন্তর্গত অসিধারী যোদ্ধৃগণ প্রধান বাহিনীর রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত এবং পদাতিক সৈন্যের অন্তর্গত তীরন্দাজগণ দূর হইতেই শত্রু আক্রমণকে প্রতিহত করিত। রথীগণ আহতদিগকে শিবিরে লইয়া যাইত, এবং শত্রুর পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিত। অশ্বারোহী সৈন্যদল খাদ্যদ্রব্যাদি স্থানান্তরে প্রেরণ সময়ে রক্ষী স্বরূপে প্রেরিত হইত; প্রত্যাবর্ত্তনকালে বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিত, এবং পলায়মান শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিত। গজারোহী সৈন্যদল শত্রুর শ্রেণী ভঙ্গ করিত, দেওয়াল, পরিখা ভেদ করিয়া শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিত, সৈন্যদলের গতিবিধি সময়ে সর্ব্বাগ্রে চলিত, এবং বিধ্বস্ত সৈন্যদল গজরাজির পশ্চাতে আসিয়া আবার নিজ নিজ দল নব সৈন্য দ্বারা পুনর্গঠন করিত। বর্ত্তমান সময়ে সুবৃহৎ কামান সমূহই প্রাচীনকালের হস্তীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

যুদ্ধোপকরণ

যুদ্ধের উপকরণ অস্ত্র ও শস্ত্র এই দুই ভাগে সাধারণতঃ বিভক্ত ছিল। অস্ত্র দূর হইতে শত্রুর উপর নিক্ষিপ্ত হইত এবং শস্ত্র হননের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। অস্ত্র আবার সাধারণ ও দৈবীশক্তিসম্পন্ন এই দুই ভাগে বিভক্ত হইত। তরবারি প্রভৃতি শস্ত্রের অন্তর্গত।

যুদ্ধক্ষেত্রে ধনু, অসি, নালিকাস্ত্র ও মন্ত্রশক্তি এই চারি প্রকার যুদ্ধোপকরণের কথাই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অর্থশাস্ত্রে মন্ত্রশক্তির প্রয়োগের বিশদ বিবরণ কিছু দৃষ্ট হয় না। এতন্মধ্যে নালিকাস্ত্রের উপরই বিশেষ আস্থা স্থাপন করিবার কথা আছে। লৌহ, সীস ও তাম্র দ্বারা গোলা প্রস্তুত হইত। সোরা, গন্ধক ও কয়লা ৫।১।১ এই অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া বারুদ প্রস্তুত করা হইত; হাল্কা কাষ্ঠ, মৃদু আলে দগ্ধ করিয়া ভস্মরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত করতঃ কয়লা প্রস্তুত করা হইত। শত্রুসংহার ব্যাপারে নগর ও দুর্গ ধ্বংস কার্য্যে কামানের সম কার্য্যকারী কিছুই ছিল না। কর্ণযুক্ত তীর বিষাক্ত করিয়া নিক্ষেপ করা হইত। যখন সৈন্যগণ দেহে বর্ম্ম ধারণ আরম্ভ করিল, তখন ধীরে ধীরে অসি ধনুর্ব্বাণের স্থান অধিকার করিল। যোদ্ধৃগণ ধাতু নির্ম্মিত বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিত, চর্ম্ম নির্ম্মিত বর্ম্ম অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হইত। গুরুভার-বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী সৈন্যের প্রথা বর্ত্তমান সময়ে বহুকাল হইল উঠিয়া গিয়াছে, সম্প্রতি কিন্তু ফরাসী সৈন্যগণ পরিখা যুদ্ধে এলিউমিনাম নামক ধাতু নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেছেন।

যুদ্ধের সময়

ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, আত্মরক্ষার গত্যন্তর না থাকিলে তখন যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। অর্থশাস্ত্রে আমরা ইহার বিপরীত পাই—রাজার জয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিলে কাল বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। বর্ত্তমানে উভয় নীতিই অনেকে খাটাইতেছেন। যখন রাজার চতুরঙ্গ বল ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়, সামরিক উত্তেজনা ক্রমশঃই দেশ মধ্যে জা'গয়া উঠে, তৎকালে তিনি দেশের একতা রক্ষার জন্য কোন বহিঃশত্রুকে আক্রমণ করিবেন। গত ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের কারণ অনেকটা এই ধরণের। যখন রাজা দেখিবেন তাঁহার কর্ম্মচারীরা দক্ষ ও উপযুক্ত এবং তাঁহার অনুপস্থিতে দেশের আভ্যন্তরিক গোলমাল দমনে সমর্থ, রাজা কেবল সেই সময়েই পর রাজ্য আক্রমণে অভিযান করিবেন, শত্রুকে বিপদ্ জালে পরিবেষ্টিত এবং তাহার সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষের ভাব দেখিলে তিনি অবিলম্বে শত্রুকে আক্রমণ করিবেন।

উদ্যোগ পর্ব্ব

যুদ্ধ করা স্থির নিশ্চয় হইলে রাজা জয়লাভের জন্য যত উপায় সম্ভব তাহা অবলম্বন করিবেন। নিজ শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিজ রাজ্য মধ্যে কোন গোলযোগ না ঘটে, তাহার প্রতি রাজা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। যাহাতে শত্রু গুপ্তচর দ্বারা মিত্রশক্তিপুঞ্জের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটাইতে না পারে, তাহার প্রতি রাজা খর দৃষ্টি রাখিবেন। নিজ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্বেষভাব না জন্মে, অনুপস্থিতকালে শত্রু নিজ রাজ্য আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া রাজা বিজয়যাত্রা করিবেন। শত্রুকে দুর্ব্বল করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। শত্রু-রাজ্যের শান্তি নষ্ট করিতে হইবে; উৎকোচ কিংবা উৎকোচের বৃথা আশা দিয়া শত্রুর মিত্রশক্তিপুঞ্জকে স্বপক্ষে আনিতে চেষ্টা করিতে হইবে। রসদ পত্রাদি যাহাতে শত্রু রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইতে হইবে। শত্রুনীতিতে শত্রু-সৈন্যকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। রাজা সাম্যনীতিতে নিজ প্রজাকে সন্তুষ্ট করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করাইবেন, এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসম্ভার নিজ দেশ মধ্যে মজুত রাখিবেন। শত্রুনীতিতে উল্লেখ আছে, রণযাত্রা কালে রাজা উপযুক্ত চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী এবং ঔষধাদি সঙ্গে লইবেন।

রাজা নিজ সৈন্যযাত্রাপথ সুবিধাজনক এবং শত্রুপক্ষের গমনাগমনের পথ বিপদসঙ্কুল করিবেন। যথায় জল খাদ্য তৃণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তথায় রাজা যুদ্ধ শিবির স্থাপন করিবেন। রাজা শিবির সান্নহিত জনপদ হইতে আপন ইচ্ছামত খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন। শস্যক্ষেত্র হইতে যাহাতে অন্য পক্ষ আহার্য্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তজ্জন্য অগ্নি সংযোগে উহা নষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু রাজা স্থানীয় দেব-মন্দিরের প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। শত্রুপক্ষের রাজ্যস্থিত সাধারণ প্রজাবৃন্দ যাহাতে অন্যায়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়,

তৎপ্রতি সুদৃষ্টি রাখিবেন। নিজ রাজ্য অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রজাবৃন্দকে দুর্গ মধ্যে আশ্রয় প্রদান করিবেন। পার্ব্বত্য পথ, নদীতীর এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় স্থানসমূহ সুরক্ষিত করিতে হইবে। শত্রু যে যে পথ অতিক্রম করিবে, তাহার সন্নিহিত জলাশয়, কূপ প্রভৃতি জলশূন্য কিংবা বিষাক্ত করিতে হইবে। শত্রু যাহাতে স্বরাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গগুলি স্বাধিকারে আনিয়া নিজ আক্রমণের সুবিধাজনক কেন্দ্র গঠন করিতে না পারে, সে জন্য ঐ দুর্গগুলিকে ভূমিসাৎ করিতে হইবেক। পবিত্র বৃক্ষাদি ভিন্ন অপর সকলের শাখা ছেদন করিতে হইবে এবং হোমাদি যজ্ঞ কার্য্য ব্যতীত দিবাভাগে কোন বাটীতেই কেহ অগ্নি জ্বালাইতে পারিবে না।

মনুসংহিতায় শরৎ কিংবা বসন্তকালে নরপতিদিগের পর-রাজ্য আক্রমণের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ে আকাশ পরিষ্কার থাকে, এবং ছাউনিতে বাসের উপযুক্ত সময়। এই সময় ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ, বৃক্ষাদি ফলসমন্বিত এবং পানীয় জলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের সুযোগ ও শত্রুর দুর্ব্বলতা দর্শন করিলে সেই সময়কেই উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করিতে হইবে।

অভিযানকালে পার্ব্বত্য জাতি সর্ব্বপ্রথমে অগ্রসর হইবেক। তাহার পর হস্তী, রথ এবং অশ্বারোহী সৈন্যদল পর্য্যায়ক্রমে অগ্রগমন করিবে। রাজা, কোষ এবং অঙ্গনাগণ মধ্যভাগে অবস্থান করিবেন। সৈন্যাধ্যক্ষগণ বাহিনীর পুরোভাগে অবস্থান করিবেন; সেনাপতি মনোনীত যোদ্ধৃবর্গ কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিবেন। বাহিনীর উভয় পার্শ্ব অশ্বারোহী সৈন্য কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইবেক। মধ্যস্থল হইতে শেষভাগ অশ্ব, রথ, হস্তী ও পার্ব্বত্যজাতি দ্বারা আবার পর্য্যায়-ক্রমে সুরক্ষিত থাকিবে।

অভিযানকালে পথিমধ্যে বিশ্রাম ও রাস্তাঘাটের বিবরণ অবগতির জন্য সুবিধাজনক স্থানে ছাউনি ফেলিতে হইবেক। রণমধ্যে বিশ্রাম স্থানই নিরাপদ বিবেচিত হইত। চতুর্ভুজ আকারে শিবির স্থাপন করা হইত। রাজশিবিরে অর্থ ও স্ত্রীলোকদিগের বাসস্থান নির্দ্ধারিত থাকিত। শিবির মধ্যে কুচ কাওয়াজের জন্য যথেষ্ট স্থান রাখা হইত। বৃত্তাকারে বহু ধনুর্দ্ধারী সতর্কভাবে সর্ব্বদা শিবির রক্ষণে নিযুক্ত থাকিত। রাজ-তাঁবুর নিকট সুদক্ষ গজারোহী সৈন্যেরা প্রহরা দিত। রাজা সর্ব্বদা সশস্ত্র থাকিতেন। গুপ্তভাবে কণ্টকাকীর্ণ পরিখা প্রস্তুত করিয়া শিবিরের চতুর্দ্দিক সুরক্ষিত করা হইত। খাদ্য সংগ্রহ ও শত্রুর গতিবিধি নির্ণয়ের জন্য অশ্বারোহী চর নিযুক্ত করা হইত।

রণক্ষেত্রে

বিভিন্ন সৈন্যদল পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে, এমত অবস্থায় রণক্ষেত্রে অবস্থান করিবে। সুশিক্ষিত সৈন্যদল পুরোভাগে অবস্থান করিবে, বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের উপরও সুদৃষ্টি রাখিতে হইবেক। সৈন্যগণের সম্মুখে অসিধারী, তাহার পর ধনুর্দ্ধারী, তদনন্তর

অশ্বারোহী ও রথী অবস্থান করিবেক। সকলের সম্মুখে সেনাপতি ও সহকারী সেনাপতিগণ পরিবৃত হইয়া সৈন্যের গতিবিধিনির্দ্দেশক পতাকা ধারণ করিয়া অবস্থান করিবেন, রাজা বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবেন। তিনি সতর্কতার সহিত আত্মরক্ষা করিবেন, কারণ তাঁহার বিনাশেই সমুদয় সৈন্যের ধ্বংসের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

মনু বলেন, শত্রুকে দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লওয়াইতে বাধ্য করিতে হইবে। দুর্গ অজেয় ও দুর্ভেদ্য বোধ হইলে তাহা অবরোধ করিতে হইবে। অবরোধ-ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নাগরিক-গণের উপর কর ধার্য্য করিতে হইবেক। পানীয় জল বিষাক্ত করিতে হইবে।

আবশ্যকানুযায়ী মকর, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্রসূচী, মণ্ডল প্রভৃতি ব্যূহ রচনা করিতে হইবেক। কামন্দকীয় অর্থনীতিতে উল্লেখ আছে, ছলনাপূর্ব্বক পশ্চাদ্বর্ত্তন করিয়া জয়োল্লাসযুক্ত শৃঙ্খলাহীন শত্রুসৈন্যকে সহসা আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিবে, মধ্যে মধ্যে মিথ্যা জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দূরস্থিত শত্রুর অপর বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিবে।

ধর্ম্মযুদ্ধে রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত রণরঙ্গে লিপ্ত হইবেক। পুরুষোচিত উদারতা রণক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইবে, শত্রুকে যথাশক্তি যুদ্ধ করিবার পূর্ণ সুযোগ দান করিতে হইবে। কূট যুদ্ধের নিয়ম তাহা নহে, ছলে বলে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধিই এই যুদ্ধের প্রধান নীতি। ধর্ম্মযুদ্ধে বিষাক্ত তীর, যানভ্রষ্টের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ, যুক্ত করে "অহং তবাস্মি" উচ্চারণকারী রণবিমুখ ব্যক্তিকে আক্রমণ, উলঙ্গ, অস্ত্রহীন, নিরপেক্ষ, নিদ্রিত, ভীত, পলায়নপর, অস্ত্রশস্ত্রবাহী যুদ্ধে অপারগ ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ বিশেষভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

বন্দীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে হইবে, আহত শত্রুসৈন্যের সুচিকিৎসা করিতে হইবে, অবিবাহিতা নারী বন্দিনী হইলে তাহার প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইতে হইবে, রাজার প্রস্তাবিত সৈনিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহে অসম্মত হইলে সাবধানে তাহাকে নিজ রাজ্যে প্রেরণ করিবে। কোন নগর অধিকৃত হইলে কলাবিদ্যায় পারদর্শী, মোক্ষকামী, রুগ্ন ও বিকৃত-মস্তিষ্কের প্রতি কোনও প্রকার অত্যাচার না হয়, তজ্জন্য রাজা বিশেষ আজ্ঞা প্রদান করিবেন। রণশেষে দক্ষ সৈন্যদিগের পুরস্কার রাজা ঘোষণা পত্রে প্রকাশ করিবেন। নিজ বাহুবলে শত্রুদমনকারী সৈনিকেরা বিপক্ষের রথ, অশ্ব, হস্তীর অধিকারী হইবেন। বহুমূল্য মণি মাণিক্যাদি ও অর্থ রাজকোষে লইবেক। পরাজিতা রাজস্ত্রীকে নিজ মাতার ন্যায় সম্মানে রক্ষা করিতে হইবে। পরাজিত দেশের রীতি নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবেক। আহত ও মৃত সৈন্যের পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের ভার রাজা গ্রহণ করিবেন, বিজয়লব্ধ দ্রব্যসামগ্রী যথাসম্ভব প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইবেক।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

প্রাচীন ভারতের নৌ-বাণিজ্য

ভারতবর্ষ এক সময়ে নৌ-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে, বেদে ও পুরাণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সভ্যতা যে কত যুগান্তরের কত প্রাচীন আজও তাহার মীমাংসা হয় নাই। প্রাচীন সভ্যজাতির ইতিহাসে ভারতের পণ্য-সামগ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুদূর পশ্চিম ইউরোপ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় বণিকগণের গতিবিধি স্মরণাতীত যুগ হইতে ছিল, তাহার প্রমাণ এই সকল দেশের প্রাচীন লেখকগণের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়। যে সময় হইতে সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিপ্লবের ভাবী আশঙ্কা করিয়া হিন্দু-স্মার্ত্তগণ সমুদ্রযাত্রা-নিষেধ-বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছেন, সেই সময় হইতে ভারতীয় নৌ-বাণিজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষ কোন দিন কৃষিপ্রধান ছিল না। ভারতবর্ষ প্রকৃতির কৃপায় স্বভাবতঃ কৃষি-পণ্যের প্রধান উপযোগী স্থান। অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ ভারতবাসীকে কৃষিজীবী হইবার উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু পুরাকালে এদেশবাসী কখনও কৃষিজীবী ছিল না। ভারতবাসী শিল্পাদির উপর নির্ভর করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। প্রাচীনকালে ভূমির আদর ছিল না। মহারাজ রাজবল্লভের বাগরু গোমেধপুর পরগণা সূর্য্যাস্ত-আইনের বিধানমতে নীলামে উঠিলে কেহ ডাকিয়াছিল না। অবশেষে সরকার বাহাদুর বাধ্য হইয়া স্বয়ং এক টাকা মূল্য দিয়া এই পরগণা খরিদ করিয়া খাস-মহালের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। [Calcutta Review—Khash Mahal, 1869] মানবধর্ম্ম-মীমাংসায় ভগবান্ মনু কৃষিকার্য্যকে হেয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের উপর ইহা বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম্মের একটী প্রকৃষ্ট প্রভাব বলিতে হইবে। মনু বলেন,—

> বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োপি বা।
> হিংসা প্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥
> কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতাঃ।
> ভূমিং ভূমিশয়াং শ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়ো মুখম্॥ [মনু ১০ম অঃ ৮৩-৮৪]

কৃষি, মনুর শাসনে হিন্দুসমাজ হইতে উচ্চবর্ণের অকরণীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ নদীবহুল দেশ। এদেশের লোকে প্রাচীনকালে নৌকাপথে গমনাগমন করিত। এক দেশ হইতে অন্য দেশে নৌকাপথে পণ্যসামগ্রীর আমদানী বা রপ্তানী হইত। এই জন্য নদীর কূলে কূলে প্রাচীন নগর বা বন্দরাদির অবস্থিতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালের রেল বা ষ্টীমারের কার্য্য সে সময় নৌকা দ্বারায় সুসম্পন্ন হইত। নৌকা নির্ম্মাণ বা নৌকার ব্যবসায়ে অনেক লোক খাটিত। আজকাল নৌকাগঠন কার্য্য লোকে এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। দেশে সুশিক্ষিত নাবিক বা মাঝির অভাব হইয়াছে। কালের প্রভাবে নদী বিল

প্রভৃতি মজিয়া যাওয়ায় দেশের মধ্যে রেল-ষ্টীমারের বহুল প্রচার হওয়ায় এখন আর পূর্ব্বের মত নৌকার আদর নাই। কাজেই নৌকাশিল্প লোপ পাইতে বসিয়াছে।

বাইবেল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যুসফ মিশরদেশে যাইয়া ইস্রায়েলগণকে ভারতীয় ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ-উৎপন্ন নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ও বলকারক ভক্ষ্যাদির ব্যবসা করিতে দেখিয়াছিলেন [Bible, Genesis XXXVII—29]। খৃষ্ট জন্মিবার দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যুসফ বর্ত্তমান ছিলেন প্রাচীন মিশর দেশের সহিত ভারতবর্ষের স্মরণাতীত কাল হইতে বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, আমরা বাইবেল হইতে তাহার নিদর্শন পাইতেছি। ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ যে ভারতীয় আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া আর্য্য-উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ, সুমিত্রা, যাবা, বালি, মলয় প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে আজও যে সকল হিন্দু দেবদেবীর অস্তিত্ব চিহ্ন আছে, তাহা দ্বারাই সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে। আদি কবি বাল্মীকির "রামায়ণ" আজিও যাবা দ্বীপে প্রচলিত আছে। এই রামায়ণ সপ্তকাণ্ড নহে, মাত্র ছয় কাণ্ডে সমাপ্ত। উত্তরকাণ্ড যাবাদ্বীপে পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, উত্তরকাণ্ড রচনা হইয়া প্রচার হইবার বহু পূর্ব্বে হিন্দুগণ যাবা দ্বীপে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন [Elphinstone's History of India]। দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে কোন্‌টি (Conti) নামে একজন ইতালীদেশের পরিব্রাজক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে যান। তথা হইতে স্বদেশে পারস্য দেশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। কোন্‌টি (Conti) ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ দ্বারা এই সকল দ্বীপপুঞ্জ অধ্যুষিত দেখিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়, যে দিন কুশীনগরে মহাবৃক্ষতলে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেইদিন বঙ্গদেশ হইতে সপ্তশত সহচর সহ বিজয়সিংহ সিংহলে অবতরণ করেন। বুদ্ধদেব ইন্দ্রকে ডাকিয়া বিজয়সিংহকে রক্ষা করিবার ভার দেন। বিজয়সিংহ সিংহল জয় করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। বঙ্গ-উপসাগর ভেদ করিয়া সপ্ত শত লোকের উপজীব্যাদি বহন করিয়া যে তরী বঙ্গদেশ হইতে সে সময়ে সিংহলে যাতায়াত করিত, তাহাকে আধুনিক কালের জাহাজ বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। বৌদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কাল আজও স্থির হয় নাই। অনেকের মতে উহা ৫৪৩ পূঃ খৃঃ। চব্বিশ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার লোকে বিষয়-কার্য্য বা বাণিজ্য উপলক্ষে সিংহলে যাতায়াত করিত। বাঙ্গালীর নিকট সাগরযাত্রা বা ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জাদি অপরিজ্ঞাত ছিল না। বিজয়-সিংহের সিংহলবিজয়-কাহিনী হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী-কাব্যের শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহলযাত্রা-কাহিনী কবি-কল্পনা হইলেও কবিকে দেশাচার বা সমাজের দাস বলিতে হইবে। কবি যে সমাজের লোক, সেই সমাজের বর্ণনায় তাহার রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতির বিরোধী কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই। কবিকঙ্কণের সময়েও যে ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, কবি কল্পনায়

সাহায্যে তাহারই আভাষ দিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদে "পণি" নামধেয় এক বণিক্‌জাতির উল্লেখ আছে। এই "পণি"গণ পশুপালন ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে রত ছিল। আর্য্যগণ পণিদের গবাদি অপহরণ করিতেন। অর্থর্ব্বা নামক এক ঋষির সহিত পণিগণের গোধন লইয়া বিবাদের উল্লেখ আছে। [ঋগ্বেদসংহিতা ১ মণ্ডল ৮৩।৪]। তৎপর অযাস্য অঙ্গিরার সন্তানগণ পণিগণের সহিত অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ করেন। এই বিবাদে রূপযৌবন-সম্পন্না সরমা নাম্নী এক রমণী দূতীর কার্য্য করিয়াছিল [ঋগ্বেদ ১০।১০৮।৭] সরমা পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে সুদূর গান্ধারের রসা নদী অতিক্রম করিয়া "পণি" নগরে উপস্থিত হইয়াছিল। ঋষিগণের পক্ষে রাজা অসমাতি ও দভীতি পণিগণের উচ্ছেদ সাধনে আঙ্গিরসগণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এমন কি ঋষি মুদ্‌গলপত্নী ইন্দ্রসেনাও পণিযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। একটী ঋকে ইন্দ্রসেনার কার্য্যকলাপের এইরূপ পরিচয় আছে,—

উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রং।
রথীরভূন্মুদ্‌গলানী গবিষ্ঠৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিন্দ্রসেনা ॥

[ঋক ।১০।১০২।২]

সরস্বতীকূলে পণি ও ঋষিগণের এই ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, সিন্ধু সৌবীর দেশে রাজর্ষি রহুগণের রাজত্বকালে আঙ্গিরস ব্রাহ্মণ কুলে জড়ভরতের জন্ম হয়। সে সময়ে ভারতে ভদ্রকালীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। পণিগণ ভদ্রকালীর উপাসক ছিলেন। পণিপতি জড়ভরতকে ভদ্রকালীর নিকট বলি দিবার আয়োজন করেন। ভদ্রকালী পণিপতিকে দলবল সহ বধ করিয়া জড়ভরতকে রক্ষা করেন। পণিগণকে ভাগবতকার বৃষল নামে অভিহিত করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা বেদহীন বা বেদাচারহীন ছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী কালের ঘটনা হইতে জানিতে পারা যায়, পণিগণ পঞ্চনদ প্রদেশ ত্যাগ করিয়া এসিয়া-মাইনরে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

পণিগণ আঙ্গিরসগণ কর্ত্তৃক আর্য্যভূমি হইতে নিষ্কাশিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে এবং জলপথে পশ্চিমাঞ্চলে রওনা হইয়া গিয়াছিলেন; তাহার উল্লেখ ঋগ্বেদ-সংহিতায় আছে। পণিপতি তুগ্রের সন্ততিগণ জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক পোতারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিলে, প্রবল ঝড়ে তাহাদের পোত জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে, "অশ্বিদ্বয়" নামক দেবতারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। আজকাল জলমগ্ন পোতের আরোহীদিগকে সমুদ্রগামী অপর পোত যেমন উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে অবতরণ করিয়া দিয়া থাকে, সেই বৈদিকযুগে ভারতীয় আর্য্য নাবিকগণের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন ছিল। পণিপতি তৌগ্র্য অশ্বিদ্বয়ের উপাসক ছিলেন। "অশ্বিদ্বয়"কে সম্বোধন করিয়া তৌগ্র্য এই ঘটনার উল্লেখে বলিতেছেন :—

"যুবমেতং চক্রথুঃ সিন্ধুষু প্লবমাত্মন্বং তং তৌগ্র্যায়কং।
যেন দেবত্রা মনসা নিরূহথুঃ সুপপ্তনী পেতথুঃ ক্ষোদসো মহঃ ॥

অববিদ্ধং তৌগ্র্যমপ্সু ংতরনারংভণে তমসি প্রবিদ্ধং।
চতস্র নাবো জঠলস্য জুষ্টা উদশ্বিভ্যা মিশিতাঃ পারয়ন্তি॥"

[ঋগ্বেদ-সংহিতা ১।১৮২।৫-৬]

ভারতবর্ষ হইতে "পণি" নামে একদল বণিকজাতি পশ্চিম সাগরের পর পারে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সভ্য জগতের সমুদয় বাণিজ্য হস্তগত করিয়া এক শক্তিশালী জাতিতে যে পরিণত হইয়াছিল, বেদ তাহার আভাষ দিতেছেন।

এই "পণি"গণ পঞ্চনদ প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর আসিয়া-মাইনরে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। পিকক্ সাহেব [Peacock] গ্রীসে ভারত ("India in Greece" page 218) নামক গ্রন্থে গ্রীসে ভারতবর্ষের প্রাধান্যের বিষয় প্রমাণ করিতে যাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ফিনিসিয়ান নামে আদিম বাণিজ্যকুশল জাতির আদি নিবাস গান্ধার প্রদেশে ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর ঐতিহাসিক হেরোদোতাসের মতে ফিনিসিয়ানদের আদি বাসস্থান পারস্য উপসাগরের কোনও এক স্থানে ছিল। গ্রীক ও জারমানগণ ফিনিসিয়ানদিগকে ফিনিক (Phœnic) নামে অভিহিত করিয়াছেন। রোমক ইতিহাসে ইহাদের নাম পুনিক (Punic) বলিয়া লেখা আছে। রোমরাজ্যের অভ্যুদয়ের সময় পুনিকদের রাজধানী কার্থেজ ছিল। দাক্ষিণাত্য হইতে দ্রাবিড়গণ খৃষ্টের তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ব্যাবিলনে যাইয়া আধিপত্য স্থাপন করেন, এ কথা হল সাহেব "সমীপবর্ত্তী পূর্ব্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস" (Hall's Ancient History of the Near East) নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, "ফিনিক"গণ খৃষ্ট জন্মিবার ৩০০০ বর্ষ পূর্ব্বে সিরিয়া দেশের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভূমধ্য সাগরের যাবতীয় বাণিজ্যসম্পদ হস্তগত করিয়া এক বিরাট শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। ঋক্-মন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, ঠিক এই সময়ে ভারতীয় "পণি"গণ ভারতীয় বৈদিক সভ্যতা, আচার ব্যবহার, দেবদেবীর পূজাপদ্ধতির সহিত, পোতারোহণে যাইয়া পশ্চিম আসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। পণিক ও ফিনিক শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য বা মিল দেখিয়া এই দুই জাতীয় লোক যে এক ছিল, তাহা আমাদের অনুমান হয়। বহু শতাব্দীর পরিবর্ত্তনে এখন আর পণিজাতির আমরা কোনও সন্ধান পাইতেছি না। পণিগণ বিদেশে যাইয়া ফিনিক হইয়া ভারতবাসীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত এক নবজাতি হইয়াছে। পরে রোম সাম্রাজ্যের সহিত সংঘর্ষে একেবারে পণিগণের মত ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া বাণিজ্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়া আপন অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে। এককালে ভারতও যে Mother of Nations ছিল, পণিগণের পোতারোহণে বাসস্থানান্বেষণে পশ্চিম সাগরের উপকূলে বাসস্থান স্থাপনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজ কয়েক বৎসর হইল, আসিয়া মাইনরে একখানা কিলক-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এই লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। এই লিপি দুইজন রাজার পরস্পর সন্ধিপত্র। রাজদ্বয়ের নাম রাজ-মত্তি-উ-অজ এবং মিত্তনি-

পতি অনুকিলুউম। ইহাতে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি নাম আছে। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ পণিগণের উপাস্য দেবতা। গ্রীক ও হিন্দু নামক গ্রন্থ যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ভূমধ্য সাগর ও তাহার উপকূলে এককালে যে হিন্দু-উপনিবেশ ছিল তাহা সহজেই স্বীকার করিবেন।

মনুসংহিতায় সমুদ্রপথে ভ্রমণের কথা আছে। মনু সমুদ্রপথের দূরত্বানুযায়ী ভাড়ার কোন হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই ; কেবল বলিয়াছেন :—

সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি। [মনু—৮ অধ্যায় ১৪৭]
দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথা কালং তরো ভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্॥

প্রাচীন কালের কবিগণ আপন আপন কাব্যে বা পুরাণে সমুদ্রের মধ্যস্থিত বিভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত পোতের সহিত নানা উপমার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। দেশের লোক যদি সে অবস্থা-ভিজ্ঞ না হইত, তাহা হইলে ঐ সকল উপমা সহজে বোধগম্য হইত না। চণ্ডীর ফলশ্রুতিতে আছে—"অঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।"

মহাভারতের নানাস্থানে পোতের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। বিদুর পাণ্ডবগণের পলায়ন করিবার জন্য মনোমারুতগতি যুণিবাতাদি সহ একখানা পোত পাঠাইয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা আধুনিক বাষ্পীয় পোতের অনুরূপ :—

ততো প্রবাসিত বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনো মারুতগামিনীম্॥
সর্ব্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথী তীরে নরৈর্বিস্রং সিভিঃ কৃতাম্॥
[মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৪৯ অধ্যায়—৪—৫]

শিল্প-সংহিতা নামে একখানা প্রাচীন পুঁথি আছে। এই সংহিতা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা প্রণীত। শিল্প-সংহিতায় দূরদর্শন নামে এক প্রকার যন্ত্রের উল্লেখ আছে। ইহা আধুনিক দূরবীক্ষণ কিনা বলিতে পারি না। তবে এই যন্ত্রের সাহায্যে আর্য্যনাবিকগণ সমুদ্রের অনন্ত নীলিমার মধ্যেও দূরের জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আপন আপন পোত চালনা করিতেন। জাহাজ ডুবির ভয় হইতে এই যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধার পাইতেন।

মনোর্বাক্যং সমাধায় দেবশিল্পীন্দ্র শাশ্বতম্।
যন্ত্রং চকার সহসা দৃষ্টার্থে দূরদর্শনম্।
পলালগ্নে দণ্ডমুদা কৃত্বা কাথ মনশ্বরম্॥ [শিল্পসংহিতা অষ্টাদশাধ্যায়]

জতুগেহ হইতে নৈশ অন্ধকারের মধ্য দিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা যখন পলায়ন করিয়া-'ছলেন সে সময়ে তাঁহারা নক্ষত্রবিশেষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দিগ্‌নির্ণয় করিয়া পথ

চলিয়াছিলেন। ভারতীয় নাবিকেরা ধ্রুবতারা চিনিতেন। এখন এদেশে এমন লোক আছেন, যিনি নৈশান্ধকারে কেবলমাত্র তারকাবলী দেখিয়া দিক্ ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন। আর কিছু দিন পরে এমন লোক আর খুঁজিয়া মিলিবে না।

রামায়ণে সাগর-বন্ধন করিবার বর্ণনা আছে। অনেকে বলিতে পারেন, ভারবাহী নৌবহরের প্রচলন থাকিলে রাম সাগরবন্ধনরূপ এরূপ দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মহাভারতের বনপর্ব্বমধ্যে সংক্ষিপ্ত রামায়ণ আছে। মহাভারতকার শ্রীরামচন্দ্রের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, সমুদ্রগামী পোত সংগ্রহ করিয়া সৈন্য পার করিলে বণিক্‌কুলের ক্ষতি হইবে, দেশের বাণিজ্য-ব্যাপার বন্ধ হইয়া যাইবে। রামায়ণে উল্লেখ আছে, লঙ্কা ও ভারতবর্ষের মধ্যে সাগরজলে ইন্দ্র-ভয়ে হিমাদ্রিতনয় মৈনাক পর্ব্বত ডুবিয়া আছে। সেকালের ভারতীয় নাবিকগণ এই জলমগ্ন পর্ব্বতের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন। এখনও ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্য দিয়া কোনও পোত গতায়াত করিতে পারে না। সিংহলের দক্ষিণ প্রান্ত গল অন্তরীপ দিয়া গতায়াত করিয়া থাকে। এখন ভারতবর্ষ ও সিংহল লৌহবর্ত্ম দ্বারা সংযোজিত হইলেও মধ্যে ক্ষুদ্র বাষ্পীয়পোতে যাত্রিগণ পারাপার করিয়া থাকে। যে কবি বর্ণনা করিয়াছেন যে, গঙ্গা বঙ্গোপসাগর সঙ্গম-স্থলে পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই স্থান অতলস্পর্শ, সে কবি বঙ্গোপসাগরের "Swatch" বিষয় অবগত ছিলেন। সমুদ্রপথে গতায়াত না থাকিলে সমুদ্র-জলের গভীরতার জ্ঞান জন্মিতে পারে না। মহাভারতকার লবণ সমুদ্রের বর্ণনা করিতে যাইয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন, মহর্ষি অত্রি ইহার গভীরতা সপ্তবার চেষ্টায় পরিমাপ করিতে পারেন নাই। সমুদ্রযাত্রী আর্য্যগণও কোন সাগরের গভীরতা কত তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মত স্থির করিয়াছিলেন। মহাকালের মহাশক্তির প্রভাবে ভারত হইতে সে বিদ্যা লোপ পাইয়াছে। অনেক পুরাণাদিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সাগর, বড় বড় নদী, হ্রদ ও পর্ব্বতাদির ব্যবধানে ভাষার বিভিন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে। যদি সমুদ্রের অপর পারের লোকের ভাষাজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে আর্য্যঋষিগণ পৃথিবীর লোকের ভাষা-বিভিন্নতার এরূপ একটি প্রকৃষ্ট সূত্র প্রকটন করিয়া আমাদের মত অজ্ঞ লোকের জিগীষার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিতেন না। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থনগর পত্তনের মধ্যে উল্লেখ আছে, বহু-ভাষাবিৎ লোকদিগকে আনিয়া রাজধানীতে বসান হইয়াছিল। [আদিপর্ব্ব]। সে সময়েও ভারতবাসী নৌ-বাণিজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

এসিয়াটিক রিসার্চ্চে সপ্তদশ খণ্ডের ৬১৯-৬২০ পাতে (Asiatic Research) মিশোর দেশের এক কবির ও তাঁহার কাব্যাদির সম্বন্ধে অনেক কথার উল্লেখ আছে। কবির নাম নোন্স (Nonse)—এই কবি কোন কাব্যে হিন্দুদের কথা লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, "হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রায় চির-অভ্যস্ত। তাহারা বাণিজ্য-কুশল জাতি এবং নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী।" বিদেশী কবির এই কথায় রঘুবংশের রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনার কথা মনে উদিত হয়। জগতের কবি কালিদাস সে সময়ের বঙ্গবাসীকে

নৌযোদ্ধা বলিয়া গৌরব করিয়াছেন। রঘুবংশ ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন কাব্যে আমরা এ কথার সমর্থক কোনও বর্ণনা অবগত নহি। মিশর-কবির বর্ণনাতেও একথার উল্লেখ থাকায় নৌযোদ্ধা-বাঙ্গালী কবি-কল্পনা নহে বলিয়া সাহস করিয়া বলিতে পারি। প্রাচীনকালে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবহার-দর্শনশাস্ত্রের [International Law] প্রচার ছিল না। বাণিজ্য-ব্যাপার লইয়া জাতিতে জাতিতে সন্ধি বন্ধন ছিল না। কাজেই স্ব স্ব বাণিজ্য-সম্পদের রক্ষার নিমিত্ত নৌ-বাণিজ্য-কুশল জাতির বাণিজ্য-পোতের সহিত নৌ-বহরও প্রেরণ করিতে হইত। আমরা জাতি অর্থে এখানে ইংরাজী Nation ধরিয়া লইয়াছি। ষ্টুয়ার্ট সাহেব কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসেও বাঙ্গালীর নৌ-বহর লইয়া যুদ্ধ করিবার বর্ণনা আছে। বাঙ্গালার নৌ-বাণিজ্যের বিবরণ অনেক বিদেশী পরিব্রাজক ও ভ্রমণকারীর বর্ণনায় আছে। সে সময়ের পোতের গঠন-প্রণালী ও আকৃতি কি প্রকার ছিল তাহা এখন ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। বাণিজ্যের ইতিহাসে ফিনিসিয়ান জাতির পোতের চিত্র আছে। সে জাতি যদি ভারতীয় পণি বা বণিক জাতির নামান্তর হয়, তবে সেই চিত্রই প্রাচীন ভারতের পোতের চিত্র বলিতে হইবে।

পারস্যাধিপতি জরক্সেস যে সেনা লইয়া গ্রীস আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সৈন্যদলে হিন্দু সেনাও ছিল। হিন্দুগণ কার্পাস-বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধ করিয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতসের বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ আছে। [Carry's Translation of Herodotus p. 434.]। পোপ গ্রেগরীর সহিত খৃষ্ট ধর্ম্ম-প্রচার উপলক্ষে হিন্দুগণের আসিয়া-মাইনরে বহু-বর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল। সেই যুদ্ধে হিন্দুগণ পরাজিত হন। অসংখ্য হিন্দু সেই যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিজয়ী খৃষ্টগণ হিন্দুদিগের দেবমন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়াছিল। সেই অবধি পশ্চিম-আসিয়ায় হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মের পতন হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ রোমক ঐতিহাসিক তাসিটাসের (Tacitus) গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। প্লিনী তাসিতাসের অনুবাদক বলিয়া খ্যাত। প্লিনীর অনুবাদে পাওয়া যায় যে, খৃষ্ট পূঃ ৬০ অব্দে জারম্যান্ সাগরের উপকূলে একখানি ভারতীয় বাণিজ্য-পোত জলমগ্ন হয়। আরোহীগণ হিন্দু ছিল। ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আরোহীগণকে ধৃত করিয়া গলের (Gaul) তদানীন্তন শাসন-কর্ত্তা মেটালসের সমীপে প্রেরণ করেন। ইহার অধিক প্লিনীর অনুবাদে নাই। মার্কিসাহেব তাঁহার অনুবাদে এ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন :—

Pliny the Elder relates the facts, after Cornelius Nepos, who, in his account of a voyage to the north, says, that in the consulship of Quintus Metellus Cell and Lucius Apanius (B. C. 60) certain Indians, who had embarked on a commercial voyage, were cast away on the court of Germany, and given as present, by the king of the Survians, to Metellus who was at that times Pro-consular governor of Gaul. The work of Cornelius Nepos has not come down to us ; and Pliny, as it seems, has abridged too much.

The whole tract would have furnished a considerable event in the history of navigation. At present we are left to conjectures, whether the Indian adventurers sailed round the Cape of Good Hope, through the Atlantic Ocean and thence into the Northern seas; or whether they made a voyage still more extraordinary, passing the island of Japan, the coast of Siberia, Kamaschatka, Zembia in the frozen ocean and thence around Lapland and Norway, either into the Baltic or the German ocean.

[Tacitus translated by Murphy p. 606].

ভারতবাসীরা দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে বাণিজ্য-পোত লইয়া কোন্ পথে জারমান সাগরে উপনীত হইয়াছিলেন, মারফি তাহা জানিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। প্লিনী অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই অনুবাদ-কার্য্য শেষ করিয়া প্রাগুক্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব লোপ করিয়াছেন বলিয়া মার্ফি বড় আক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতীয় পণ্য লইয়া ভারতীয় বণিক রোম-সম্রাজ্যের রাজধানী রোমে যাইয়া বাণিজ্য করিতেন। ক্রফর্ড সাহেব প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থে প্লিনীর অনুবাদে দেখাইয়াছেন যে, If the commerce with India became a source of fortune to the industrious traders, and an important branch of revenue to the Goverment the introduction of the product of the East also headed to stimulate and increase the already excessive luxury which prevailed at Rome. Pliny states the balance against Rome of trade with the east at a hundred millions sasturces or 1, 041 666 pound sterling. Pliny when speaking of muslin terms it, a dress under whose slight veil our women contrive to show their shapes to the public.

ভারতের সহিত বাণিজ্যে রোমের কেবল বিলাসের স্রোত বৃদ্ধি করিয়াছে। এ বাণিজ্যে রোম-গবর্ণমেণ্টের রাজকোষের অর্থাগম হইয়াছে বটে, কিন্তু রোম হইতে বার্ষিক দেড় কোটী টাকা ভারতের পণ্যদ্রব্য-মূল্য-বাবদ রোমকে দিতে হইয়াছে। রোমক সুন্দরীরা মসলিন্ কাপড়ে সজ্জিত হইয়া আপনাদের সৌন্দর্য্য লোককে দেখাইতে ভাল বাসিতেন।

৪৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ হইতে ভারতে জলপথে আসিবার পথ আবিষ্কার হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে ইউরোপীয়গণ ভারতে আসিয়া বাণিজ্য করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই। ভারতবাসীর সেই আদিকাল হইতে ইউরোপীয়গণের সহিত সমুদ্রপথে বাণিজ্যাদি ব্যাপারের সম্বন্ধ ছিল। হিন্দুগণই জলপথ আবিষ্কার করিয়া বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। উত্তর মহাসাগর দিয়াও যে হিন্দুদিগের বাণিজ্য-ব্যপদেশে ইউরোপে যাতায়াত ছিল, মার্ফি তাহার আভাস তৎকৃত অনুবাদ-গ্রন্থে দিয়াছেন।

প্লিনীর বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালার সপ্তগ্রাম পুরাকালে শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। এখানে গঙ্গার সাগর-সঙ্গমস্থল ছিল। বহু বিদেশী ভ্রমণকারীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সপ্তগ্রামের নাম পাওয়া যায়। [Satgaon the Royal Emporium of Bengal from the

time of Pliny—Long] লঙ্ সাহেব যে সমস্ত প্রাচীন দলিল-পত্রাদির প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সংক্ষেপে সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে এই কথা মাত্র বলিয়াছেন। কালের পরিবর্ত্তনে সপ্তগ্রামের আর পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি নাই। এখানে যে সাগর-তরঙ্গে বাণিজ্য পোত ক্রীড়া করিত, এখন দেখিয়া আর বুঝিবার উপায় নাই।

বিষ্ণুপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা পুরুরবার পুত্র আয় ভারতবর্ষ হইতে চীন-দেশে গমন করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। আয়ুর পুত্র তিমঙ্গও পিতার সহিত গিয়াছিলেন। আয়ু মৌর্য্য-সাম্রাজ্য হইতে চীনদেশে গমন করেন। এই তিমঙ্গের নয়টি পুত্রের নাম চীনদেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই নয়টি পুত্রই ভিন্ন ভিন্ন নয়টি প্রদেশে নয়টি রাজ্য স্থাপন করেন। প্রবাদ আছে, বশিষ্ঠ মুনি চীনদেশে যাইয়া তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীব পূর্ব্বাভিমুখ-গামী বানরগণকে চীনদেশে যাইবার পথ বলিয়া দিতেছেন। মহাভারতের যুদ্ধপর্ব্বে দেখা যায়, প্রাগজ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তের সৈন্যের মধ্যে চীনদেশীয় সৈন্যও ছিল। ধর্ম্ম ও বাণিজ্য-ব্যাপারে স্মরণাতীত যুগ হইতে ভারতের সহিত যে চীনের সম্বন্ধ ছিল, এই সকল পৌরাণিক যুগের গ্রন্থে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আছে। চীনে হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দু-সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ যে যে স্থানে হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, ঐতিহাসিকগণ সেই সেই স্থানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালসহকারে হিন্দুগণ এখন চৈনিকভাষা ও নাম গ্রহণে আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত অবস্থায় আছেন। চিনিবার উপায় নাই। চীনের টৈঙ্গিয় প্রদেশে খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজক ফ্রেজার সাহেব চীনে হিন্দু রাজত্বের নিদর্শন পাইয়া ঐতিহাসিকগণকে সন্ধান দেন। তাঁহারই অনুসন্ধানের ফলে এখন চীনে হিন্দু-রাজত্বের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে 'চীন", "পট্ট" এবং "চীনাংশুক" নামে পণ্যদ্রব্যের উল্লেখ থাকায় এবং এই সকল পণ্যদ্রব্যকে পারসমুদ্রক নামে অভিহিত করায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সমুদ্রপথে এই সকল বাণিজ্য-সম্ভার ভারতে আমদানী হইত। অধ্যাপক লকু পেরির (T. D. Lacouperie) প্রাচীন চীনাসম্রাজ্যে পাশ্চাত্য-প্রভাব (Western origin of the Early Chinese civilisation) নামক গ্রন্থে আছে যে, খৃষ্ট জন্মিবার সাত শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় বণিকগণ চীনদেশে যাইয়া বাণিজ্য করিতেন, এবং উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পাশ্চাত্য পণ্ডিত বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ভারতীয় বণিকগণ (Kia chou) কিয়াচাউ উপসাগরের চারিদিকে বাণিজ্য-পোত লইয়া আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক হিন্দু-প্রভাব বিস্তার করিয়া ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। মুদ্রারাজচিহ্ন পরিজ্ঞাপক। খৃষ্ট জন্মিবার ৬৮০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে চীনে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। চীনের এই প্রাচীন মুদ্রাই তাহার একমাত্র নিদর্শন। চৈনিক ভাষায় এই সকল ভারতীয় বণিকগণকে "লঙ-ব" বলিত। এই কিয়াচাউ উপসাগরের তীরবর্ত্তী [Tosi-mo] সি-মো নামক নগরে ভারতীয় বণিকগণের টাকশাল ছিল।

চীনদেশে ভারতীয় বণিকগণের আদর ও সম্মান ছিল। চীনের রাজসভাতেও ভারতীয় বণিকগণ রাজ-সম্মানে সম্মানিত ছিলেন। খৃষ্ট জন্মিবার ৬৩১ বৎসর পূর্ব্বে কুত-লু নামক একজন হিন্দু বণিক লু-বংশীয় রাজার সভাসদ ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। লু-বংশীয়গণ শান-তুঙ্গ উপদ্বীপের রাজা ছিলেন। এই হিন্দু বণিকের সঙ্গে ধর্ম্ম-বন্ধ ছিল। হিন্দু বণিকগণকে সে সময়ে বাণিজ্য-শুল্ক দিতে হইত না, বা চীনরাজগণ তাঁহাদের নিকট শুল্ক আদায় করিতে পারিতেন না।

চীনদেশের মুদ্রাতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চীনে এক সময়ে এক মুদ্রা-সঙ্ঘ বসিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, এই মুদ্রা-সঙ্ঘ বাণিজ্যসৌকর্য্যার্থে ৬৭৫ হইতে ৬৭০ পূঃ খৃঃ মধ্যে কোন সময়ে সংগঠিত হইয়াছিল। হিন্দু বণিকগণ সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় আদর্শে চীনদেশে ধাতু-মুদ্রার প্রচলন করেন। সাধারণ লোকে এক বাক্যে বিনিময়ের মানদণ্ডস্বরূপ মুদ্রাকে গ্রহণ না করিলে মুদ্রা প্রচলিত হইতে পারে না। ভারতবাসীর এই মুদ্রা চীনদেশে বিনা আপত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের একমাত্র উপায়-স্বরূপে গৃহীত হইয়াছিল। এই মুদ্রার এক পৃষ্ঠে চীন ও অপর পৃষ্ঠে ভারতীয় বণিকগণের চিহ্নাঙ্ক মুদ্রিত ছিল। এই শ্রেণীর বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া ভারতীয় বণিককুলের কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠার প্রমাণ দিতেছে। ভারতীয় বণিকগণ এই মুদ্রা-সমিতির মুদ্রা পরিচালনের প্রায় দুই শত বৎসর পরে আবার এক শ্রেণীর বৃহদাকারের মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। [T. D. Lacouperie—Western origin of the Chinese civilization—p. 29—p. 47.] এই মুদ্রা-প্রচলনব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, চীনের মত অতি প্রাচীন দেশেও ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় ঔপনিবেশিক বণিককুলের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় সভ্যতা চীন আলোকিত করিয়াছিল।

৪৭০ পূঃ খৃঃ হিন্দু বণিক-উপনিবেশ চীনরাজগণ অধিকার করিয়া তাহাদের স্থাপিত "লঙ্গ-য" বন্দরকেই আপনাদের বাণিজ্যের রাজধানী বা প্রধান বন্দর করেন। হিন্দুগণ শক্তিহীন হইয়া চীনাদের বশ্যতা স্বীকার করেন। হিন্দুগণ এই সময়ে চীনরাজকে কতকগুলি অর্ণবপোত ও তিন হাজার নৌসেনা দিয়া সন্ধিস্থাপন করেন। হিন্দুগণই চীনরাজের পক্ষ হইয়া এই সময় হইতে বাণিজ্য-শুল্ক আদায় করিতে থাকেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে চীনদেশ হইতে বঙ্গদেশে রেসমের আবাদ ও রেসম-যন্ত্র-প্রস্তুত-প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতীয় হিন্দু বণিকগণ চীনদেশে নানাবিধ মুক্তা ও প্রবালাদির প্রচলন করেন। হিন্দুবণিকগণই ভারত হইতে ইক্ষুদণ্ড লইয়া চীনে আবাদ করেন। এই ইক্ষুর চাষ হইতে চীনদেশে চিনির ব্যবসা আরম্ভ হয়। চিনি চীন দেশ হইতে ভারতে সর্ব্বপ্রথম আমদানী হইয়াছিল। [T. De. Lacouperie "Western Origin of Chinese Civilization p. 178—181]। ৫৩ খৃষ্টাব্দে কুন্ত-এন নামক একজন শক্তিশালী হিন্দু বণিক দক্ষিণ চীনে যাইয়া কাম্বোজে এক হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। চীন

দেশের নানা বিপ্লবে বিধ্বস্ত হইয়া ভারতীয় বণিকগণ ক্রমে ক্রমে একেবারে চীন-সাম্রাজ্যের দক্ষিণে কাম্বোজরাজ্যে আসিয়া উপনীত হন এবং ক্রমশঃ নবপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশের সহিত মিশিয়া যান। ইহার পর আর চীনদেশে ভারতীয় বণিক-প্রভাব দেখা যায় না। এই কম্বোজ-গণ এক সময়ে উত্তর-বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার নিদর্শন দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ের শিব-মন্দিরের এক প্রস্তর-স্তম্ভে খোদিত আছে। একজন কাম্বোজ-অম্বয় কুঞ্জর ষট্ বৎসরে অর্থাৎ ৮৮৮ শকে এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাজার নামটী না থাকায় সকলই অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। উত্তর-বঙ্গের এক শ্রেণীর হিন্দুগণ আপনাদিগকে রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। খুব সম্ভব আধুনিক রাজবংশীগণ এই কম্বোজান্বয় হইবেন। চীনের নৌ-বাণিজ্যের অধ্যক্ষতা ভারতীয় বণিকগণের হস্তে অর্পিত থাকায় এবং ভারতীয় বণিকগণ চীনকে অর্ণবপোত ও নৌ-সেনা দিয়া সাহায্য করায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ভারতীয় বণিকগণের নিকট হইতেই চীনেরা নৌবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। কথা-সরিৎসাগরে একপ্রকার অর্ণবপোতের উল্লেখ আছে। তাহার নাম 'যানপাত্র" বা "যান-পাত্রক"। হিন্দুরা এই যানপাত্র লইয়া চীন প্রভৃতি পূর্ব্ব-মহাসাগরে বাণিজ্য-উপলক্ষে গমনাগমন করিতেন। হিন্দু বণিকের নিকট চীনেরা এই যানপাত্র নির্ম্মাণ-কৌশল শিখিয়াছিলেন। চীনেরা আজও সেই 'যানপাত্র" ব্যবহার করিতেছেন। ইংরাজীতে এই প্রকার চীনের যান-পাত্রের নাম Chinese Tunk.

বুদ্ধদেব হিন্দুর বিষ্ণুর নবমাবতার। হিন্দুধর্ম্ম এখন বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অথচ বুদ্ধ হিন্দুর অবতার। চীন, জাপান, ব্রহ্ম, তিব্বতদেশবাসীদিগকে হিন্দুর অবতারবাদের উপাসকশ্রেণীর পর্য্যায়ে আনিলে বলিতে হইবে, ঐ ঐ দেশবাসিগণ "হিন্দু"। তাঁহারা হিন্দু-স্থান হইতেই সভ্যতার আলোক পাইয়াছেন। হিন্দুস্থান হইতে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ লাভ করিয়া আপনাদের অন্তরাত্মাকে আলোকিত করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী, আচার ব্যবহার পৃথক হওয়ায় তাঁহারা হিন্দুর অপরিচিত।

ডেভিড্ রিজ (David Rhys) সাহেবের Buddhist India নামক গ্রন্থে ভারতের নৌ-বাণিজ্যের অনেক কথা আছে। ইহাই ভারতীয় নৌবিদ্যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চীন ও তিব্বতের ভারতের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মের দর্শনাদি আলোচনার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কেহ পেশোয়ার পথে, কেহ বা তিব্বত-পথে ভারতে আসিয়া পোতারোহণে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে সমসাময়িক ভারতের কৃষি-বাণিজ্যের অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজকগণের অর্ণব-পোতে স্বদেশ গমনে ভারতের সহিত চীনদেশের যে নৌ-বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই সময়ে ভারতের একস্থান হইতে অন্যস্থানে নৌকাপথে ও জলপথে গমনাগমন করা হইত। বিল সাহেবের বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় কাগজপত্রে [Beal's Buddhistic

Records, Vol II] ফাহিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এই কথা পাওয়া যায় যে, তিনি চম্পা-নগরী হইতে [প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানী আধুনিক ভাগলপুর] পঞ্চাশ যোজন পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া তাম্রলিপ্তি রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইখানে গঙ্গানদী সাগরে মিশিয়াছিল। ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তি হইতে অর্ণবপোতে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। হিউয়ান সঙও ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টের অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ ভারতের দেশবিশেষ আক্রমণ করিয়া জয় করেন। সলেমান সেই সময় ভারত-পরিভ্রমণে আরব দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন। পরিব্রাজক সলেমান ভারতের স্বর্ণপ্রসূ বাণিজ্যের কথা বলিয়াছেন। P. Ghosh সলেমানের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। Geographical Society of Paris হইতে এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। P. Ghosh তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। P. Ghosh বলেন,—During the time of the Arab invasion of India (8th Century of the Christian Era) Soleman came to this country. His account says that the Delta of the Ganges was then in a flourishing condition. There existed then many cities which traded with Arakan &c. এই সময় হইতে হিন্দু বণিকগণের আরবদেশীয়গণের সহিত নৌ-বাণিজ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। আরবগণ এই সময় হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া আধিপত্য বিস্তারের সহিত ভারতের স্বর্ণপ্রসূ বাণিজ্য এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছিল।

মোসলেম বিজয়ের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্ক-পোলো (Marco Polo) নামক একজন ইতালী পরিব্রাজক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। বোন সাহেব (Bohn) মার্ক-পোলের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইংরাজীভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মার্কপোলো এদেশের অনেক কথাই বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি বিষয়ের বর্ণনা শুনিলে আমাদিগকে অবাক্ হইতে হইবে। তিনি বাঙ্গালার গোজাতির বড় প্রশংসা করিয়াছেন :—"Oxen are found here almost as tall as Elephant, but not equal to them in bulk." আজ বাঙ্গালাদেশে গোজাতির ধ্বংসসাধন হইয়াছে, বিদেশ হইতে গরু আনিয়া বাঙ্গালার কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। মার্কপোলো আরবদেশীয় বাণিজ্য-পোতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। বাণিজ্য-পোতেই আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৪০৫ খৃষ্টাব্দে চীন-পরিব্রাজক মাহুন এবং রাল্‌ফ ফিচ (Ralph Fitch) ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণের প্রতিনিধিরূপে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও তাঁহাদের বর্ণনায় ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, নৌ-বাণিজ্যে সুদূর চীন ও মিশরদেশের সহিত ভারতবাসীর সম্বন্ধ ছিল। প্রশান্ত-মহাসাগর হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত ভারতীয় অর্ণবপোতের অবাধ গতি ছিল। অতঃপর বৈদেশিক সংমিশ্রণে শ্রুতি-স্মৃতির বন্ধনে ভারতীয় নৌ-বাণিজ্যের পতন হয়।

ভারতবাসীরা জাতিভয়ে আর "কালাপাণি" পার হইতে সাহস করে নাই। অতীতের সাক্ষী ইতিহাস খুঁজিয়া আমরা এখন তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ হইতে ভারতবাসী শিল্প-পণ্য-সামগ্রী-প্রস্তুত-প্রণালী ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়াছিল। শিল্প প্রধান দেশ ক্রমশঃ কৃষিপ্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া এখন কৃষিজীবী হইয়াছে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও জমির কোনও আদর ছিল না। আজ সেই সময়ের সহিত তুলনায় জমির মূল্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের শাসন মানিয়া ভূগর্ভস্থিত জীব-জন্তুর বধ-আশঙ্কায় কৃষি-কার্য্য একবারে পরিত্যাগ করায় নবাগত মোসলেমগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কৃষিকার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিল্প ও কৃষি এই ভাবে হিন্দুগণ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে টমাস বাউরী (Thomas Bowry) বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নাম "বঙ্গোপসাগরের পার্শ্বস্থিত দেশ সমূহের ভূ-বৃত্তান্ত"। (Geographical Account of Countries round the Bay of Bengal) সে সময়ে ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতীয় বণিকগণের নৌ-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, বাউরী সাহেবের বর্ণনায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়ে বাণিজ্য-ব্যাপারে পর্ত্তুগীজেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। ইহার ঠিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে কবিবর মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। তাঁহার নায়ক শ্রীমন্ত সদাগর বঙ্গদেশ হইতে অর্ণবপোতে বা বড় বড় নৌকায় সিংহলদ্বীপে "দক্ষিণ পত্তনে" বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিয়া লঙ্কায় কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। বঙ্গবাসীরা মুক্তা ও প্রবাল অন্বেষণে যে লক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ ও সিংহলে গতিবিধি করিত, সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক বাউরী সাহেব তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্তের সমুদ্রযাত্রা কবি কল্পনা বা অলীক স্বপ্ন নয়। কবি সে সময়ের সামাজিক অবস্থার একটিমাত্র দৃশ্যই বর্ণনা করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও দেখা যায়, এদেশে নৌকা-পথে ও সমুদ্রপথে এই দেশবাসীর অবাধ গতি ছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট মালবাহীও যাত্রীনৌকার ভাড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই ভাড়ার তালিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, গভর্ণমেণ্ট আট মাল্লার নৌকা হইতে ২৪ মাল্লার নৌকার দৈনিক ভাড়ার হার বাঁধিয়া দিয়াছিলেন :—

বজরা আট দাঁড়ির	দৈনিক	ভাড়া	দুইটাকা
„ দশ দাঁড়ির	„	„	আড়াই টাকা
„ বার দাঁড়ির	„	„	সাড়ে তিনটাকা
„ চৌদ্দ দাঁড়ির	„	„	পাঁচটাকা
„ ষোল দাঁড়ির	„	„	ছয়টাকা
„ আঠার দাঁড়ির	„	„	সাড়ে ছয়টাকা
„ কুড়ি দাঁড়ির	„	„	ছয়টাকা
„ বাইশ দাঁড়ির	„	„	সাড়ে সাতটাকা
„ চব্বিশ দাঁড়ির	„	„	আট টাকা

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ইংরেজ-গবর্ণর মুরশিদাবাদের নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে নৌকা-পথে কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে যাতায়াত করিতে ২৪ চব্বিশ দিন সময় লাগিত, কিন্তু গবর্ণরের এক মাস ছয় দিন সময় লাগিয়াছিল। সরকারী কাগজ-পত্রে গভর্ণরের নৌকা-ভাড়ার খরচার নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া যায়—

১। দৈনিক তিনটাকা হিসাবে তিন খানা বজরার ভাড়া ২১৬ টাকা।

২। কুড়ি খানা ছয় দাঁড়ের নৌকার ভাড়া মাসিক প্রতি খানার ভাড়া, ২৮৲ টাকা হিসাবে ৬৭২ টাকা।

৩। মাসিক ৩১ একত্রিশ টাকা হিসাবে ২২ বাইশ খানা আট-দাঁড়ির নৌকার ভাড়া—৮৯০ টাকা।

৪। মাসিক ৪০ টাকা ভাড়া হিসাবে ১২ বার খানা দশ দাঁড়ির নৌকা-ভাড়া ৫৭৬ টাকা।

৫। মাসিক ২৪ টাকা হিসাবে দুই খানা ৪ দাঁড়ির নৌকার ভাড়া ৫৭ টাকা।

এতদ্ব্যতীত মালবাহী নৌকার ভাড়া লইয়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা হইতে প্রধান প্রধান বাণিজ্য-স্থানের দূরত্বানুসারে কত দিনে নৌকা পৌঁছিবে এবং নৌকা-ভাড়ার মাসিক কিরূপ হার হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন—

১।	আড়াই শত মণী একখানা নৌকার ভাড়া মাসিক ২৯ টাকা।	
২।	তিনশত মণী	৩৪ টাকা।
৩।	চারিশত মণী	৪০ টাকা।
৪।	পাঁচশত মণী	৫০॥০ টাকা।
৫।	হাজার মণী	১০১ টাকা।

রেল ও ষ্টীমার হওয়ায় বড় বড় নৌকার চলন আর নাই।

কলিকাতা হইতে সে সময়ে নৌকা-পথে কোন্ কোন্ স্থানে যাইতে কতদিন লাগিত, তাহার তালিকা এই—

বহরমপুর	কলিকাতা হইতে	২০	দিনের পথ
মুরশিদাবাদ	"	২৫	"
রাজমহল	"	৩৭½	"
মুঙ্গীর	"	৪৫	"
পাটনা	"	৬০	"
বেনারস (কাশী)	"	৭৫	"
কাণপুর	"	৯০	"
ফইজাবাদ	"	১০৫	"
মালদহ	"	৩৭½	"
রঙ্গপুর	"	৫২½	"

ঢাকা	কলিকাতা হইতে	৩৭½ দিনের পথ	
লাভপুর (লক্ষ্মীপুর)	,,	৪৫	,,
চট্টগ্রাম	,,	৬০	,,
গোয়ালপাড়া	,,	৩৫	,,

এই তালিকা দিয়া সংগ্রহকার আপনার কথায় বলিয়াছেন—Those were the good old days (1792 A. D) when country were Dispatched to the upper stations, filled with goods for sale at the different stations enroute, as far as Cawnpur, Chittagong and Upper Assam (Good Old Days of Hon'ble John Company. Vol. II. page 14 to 16). দেশী নৌকা সুদূর উত্তর আসাম, কাণপুর ও চট্টগ্রাম যাইয়া দেশী শিল্পপণ্যের বাণিজ্য করিত।

বাঙ্গালা দেশে সে সময়ে জাহাজাদিও প্রস্তুত হইত। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাষ্পীয়পোত কলিকাতা খিদিরপুর ডক্ (Dock) হইতে দেশীয় কারিগর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়াছিল। এই পোতের নাম বাঙ্গালার গবর্ণর Sir John Shore এর নামে "সার জন সোর" হইয়াছিল। তারপর দেখা যায়, লক্ষ্ণৌর নবাব বাহাদুর আপনার ব্যবহার জন্য ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ সহরে ট্রিকেট নামে একজন ইন্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে দেশী কারিগর দ্বারা একখানা বাষ্পীয়-পোত নির্ম্মাণ করেন। লক্ষ্ণৌর এই পোতে ভারতের গবর্ণর লর্ড অকল্যাণ্ড সফরে বাহির হইয়াছিলেন। আফগান-সমরের সময় এই পোত সিন্ধু প্রদেশ দিয়া আফগান-প্রদেশে যুযুৎসু সেনা বহন করিয়াছিল। "সার জন সোর" নির্ম্মাণের পর সে সময়ের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ডায়ানা (Diana) এবং এনটারপ্রাইজ (Enterprise) নামক দুই খানা পোত নির্ম্মাণ করান। তারপর খিদিরপুর সরকারী জাহাজখানায় নিম্নলিখিত বাষ্পীয় পোতগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল—

১।	হারুণঘাটা	১৮৪১
২।	ব্রহ্মপুত্র	১৮৪১
৩।	ইনদাজ	১৮৪২
৪।	দামোদর	১৮৪৩
৫।	মহানদী	১৮৪৩
৬।	উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক	১৮৪৫
৭।	নর্ম্মদা	১৮৪২
৯।	দামোদর	১৮৫৩
৮।	মহানদী	১৮৪৩
১০।	নর্ম্মদা	১৮৪৫
১১।	গাধাবোট সাটলেজ	১৮৫২

১২।	লাফিয়া	১৮৪১
১৩।	গুমতী	১৮৪২
১৪।	ভাগীরথী	১৮৪৫
১৫।	সোণ	১৮৪৫

[Good Old Days of Hon'ble John Company vol II. Chapter III.]

বাঙ্গালার কারিগরেরা এই সকল জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া ইউরোপবাসীকে দেখাইয়াছিল যে, তাহাদের নৌ-নির্ম্মাণকৌশল পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। ইংলণ্ডে নির্ম্মিত জাহাজসমূহের তুলনায় এইগুলির নির্ম্মাণ-ব্যয় সামান্যই হইয়াছিল। কাষ্ঠাদির গুণে ও কার্য্যকারিতায় ইংলণ্ডে নির্ম্মিত পোত হইতে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সে সময়ের বিশেষজ্ঞেরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া কর্ণেল ওয়াকার (Colonel Walker) নামে একজন বিশেষজ্ঞ ইংলণ্ডের আবশ্যকীয় জাহাজাদি ভারতের কারিগর দ্বারা নির্ম্মাণ করাইলে সুবিধা হইবে গবর্ণমেণ্টকে এই উপদেশ দেন। ইংলণ্ডের জাহাজ ভারতে প্রস্তুত হইবার সুবিধা নাই দেখিয়া সরকার-বাহাদুর ভারতে নৌ-নির্ম্মাণ-কার্য্য হইতে বিরত হন। এ সম্বন্ধে মহামতি টেলার সাহেবও তাঁহার ভারত-ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন। (Taylor's History of India, page 216)। ভারতবাসীরা স্মরণাতীত যুগ হইতে সমুদ্রযাত্রা এবং নৌ-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকেরা একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য-জগতের সহিত ভারতের নিম্নলিখিত দ্রব্যজাতের ব্যবসা প্রচলিত ছিল :—

1. Lac
2. Cochineal
3. Dyeing
4. Silk.
5. Attar.
6. Indigo
7. Salt
8. Lime
9. Sugar
10. Ghee
11. Salt-petre
12. Tea
13. Opium
14. Paper
15. Til
16. Sandal
17. Iron
18. Muslin
19. Tobacco
20. Pan-leaf
21. Musk.
22. Kumkum
23. Barilla
24. Stone
25. Alum
26. Cotton

27. Cotton fabrics
28. Ising glass
29. Mhowa
30. Mhowa Daroo
31. Butter tree
32. Betel nut
33. Snake stone
34. Precious mineral

"অনারেবল জন কোম্পানী" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ২৩ অধ্যায়ে এই তালিকা আছে। এখন ভারতের নৌ-বাণিজ্য বলিতে গেলে পাশ্চাত্য-জাতি ও জাপানের নাম করিতে হয়। এখন ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের ভারতজাত-শিল্প-বস্তুর ব্যবসাসম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, বঙ্গদেশের সঙ্গে পাশ্চাত্যদেশের অন্য একটি ব্যবসায়ের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছে। প্রকৃতি দেবীর কৃপায় এই ব্যবসাটি বাঙ্গালার নিজস্ব। বড় সহজে কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না, কারণ প্রকৃতি তাহার প্রতিবাদী। পাট এখন বাঙ্গালাদেশ রক্ষা করিতেছে। ইংরেজ-রাজত্বের শতবর্ষ পরে "অনারেবল জন কোম্পানী" গ্রন্থের লেখক পাট-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন :—

"The trade in jute has been entirely created within the last thirty years and has a great future before it." গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। এই পাটই এখন দেশ-বিদেশে বাঙ্গালার নাম সজীব রাখিয়াছে। পাটের ব্যবসা আছে বলিয়াই আজও সুদূর পল্লীগ্রামে যেখানে সেখানে নৌকার ব্যবহার দেখা যাইতেছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরীগুলি সামান্য সামান্য কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইয়া ভারতের প্রাচীন নৌ-বিদ্যা ও নৌ-বাণিজ্যের স্মৃতি আমাদের মানস-নেত্রে অঙ্কন করিয়া দেখাইতেছে।

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

মহাকবি বাণভট্ট

ইতিহাসের উপকারিতা। আমরা উদয়নাচার্য্যধৃত কুলার্ণব তন্ত্রের একটি বচনে দেখিতে পাই :—

"চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তিরিতিহাস পুরাতনঃ।
সংকীর্ত্তয়েৎ সদা ভক্ত্যা দেবর্ষি যথাতুজাম্॥"

অনন্তরত্নপ্রসূ হইয়াও ভারত, জাতীয় ইতিহাসে বড়ই দরিদ্র। এই দরিদ্রতার কারণ-রত্নাভাব নহে—রত্নান্বেষণের অভাব। আমরা ঘরের ছেলের অপেক্ষা পরের ছেলেকে চিনিতে বেশী চেষ্টা করি। কিন্তু ভাবিয়া দেখি না যে, জাতীয় যথার্থ ইতিহাস—জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃষ্ট সোপান।

যে জাতির জাতীয় ইতিহাসে তাহার আত্মমর্য্যাদা যতই প্রকট, সে জাতি নিশ্চয়ই তত

উন্নত। জাতীয় সাহিত্যের সহিত তত্তৎ জাতির এই সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট, তাই জাতীয় সাহিত্য জাতীয়-জীবনের পরিপুষ্ট সাধক।

আজি কোন প্রাচীন সংস্কৃত মহাকবির জীবন-বৃত্তান্ত হইতে প্রাগুক্ত উক্তির যথাসাধ্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব। মহাত্মা এডিশন্‌ও বলিয়াছেন,—"কাব্য বুঝিতে হইলে, কবিকেও চিনিতে হয়।" ফলতঃ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, অবস্থা প্রভৃতি জানিতে না পারিলে গ্রন্থের প্রকৃত বিশ্লেষণ একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে।

কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৬০৭ খৃঃ) সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন। মহাকবি বাণভট্ট তাঁহারই সভাপণ্ডিত ছিলেন।

জন্ম ও ছাত্র-জীবন

উক্ত মহারাজের জীবনীই বাণের সুপ্রসিদ্ধ "হর্ষচরিত"। সুতরাং বাণভট্টেরও জন্ম ষষ্ঠ শতাব্দীতে—ইহা নির্ব্বিবাদ।

শোণনদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী "প্রীতিকূট" নগর বাণভট্টের জন্মস্থান। ইঁহার পুণ্যকীর্ত্তি পিতা চিত্রভানুভট্ট, রত্নগর্ভা মাতা রাজদেবী, পিতামহ অর্থপতি, প্রপিতামহ পাশুপত এবং বৃদ্ধ-প্রপিতামহ কুবেরভট্ট। ইনি বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ—ইহা তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি কাদম্বরীর ভূমিকায় কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ না পড়িলেও মাত্র সেই কয়েকটি শ্লোক পাঠেই তাঁহাকে পদ্যেরও মহাকবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রবন্ধ-কলেবর বৃদ্ধিভয়ে সেই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

সুনিপুণ গ্রন্থকার, মহর্ষি জাবালির আশ্রম বর্ণনছলে স্বকীয় চতুষ্পাঠী, সতীর্থ ও অধ্যাপক বর্ণনা কৌশলে সূচিত করিয়াছেন।

"কাদম্বরী" "হর্ষচরিত" "চণ্ডীশতক" "পার্ব্বতী-পরিণয় রূপক" "মুকুট তাড়িত নাটক" ও "সর্ব্বচরিত নাটক" মধ্যে বাণভট্টের অক্ষয়কীর্ত্তি কাদম্বরীই তাঁহার সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

গ্রন্থাবলী

গ্রন্থ। তিনি যদি আর কোনও গ্রন্থ না লিখিয়া মাত্র কাদম্বরীই লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি সংস্কৃত কাব্যাকাশের প্রোজ্জ্বল ধ্রুবনক্ষত্ররূপে চিরদেদীপ্যমান থাকিতেন।

বিশ্রুতকীর্ত্তি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার দিগন্তপ্রসৃত তুলিকায় যে সৌন্দর্য্য তাঁহার "কাদম্বরী চিত্রে" চিত্রিত করিয়াছেন, সে চিত্রে তুলিকা-ধারণ, আমার ন্যায় ক্ষুদ্রতমের দুরাকাঙ্ক্ষা ও পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাই কাদম্বরীর সৌন্দর্য্যচিত্রণে বিরত থাকিয়া কেবল তাহা হইতে নৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কারণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শাব্দ ও ঐতিহ্য এই প্রমাণ পঞ্চকের মধ্যে ঐতিহাসিক প্রমাণও অন্যতম।

বাণভট্টের বিবিধ গ্রন্থে তাঁহার শিশুকালেই মাতৃ-বিয়োগের উল্লেখ আছে; যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে; এই মাতৃ-পিতৃ-ব্যসন, তিনি কাদম্বরীর প্রারম্ভে সূতিকা-

গ্রন্থের প্রতিপাদ্যের সহিত গ্রন্থকারের স্বজীবনী-সমন্বয়

রোগে শুকশিশুর মাতৃবিয়োগ ও কালান্তকরূপী বৃদ্ধ শবরকর্ত্তৃক পিতৃ-হত্যায় যেন স্পষ্টতঃ সূচিত করিয়াছেন।

মহর্ষি জাবালি-পুত্র কৌমার-ব্রহ্মচারি-স্বভাব সদয় হারীত মুনির অপ্রার্থিত শুকশিশুপালন-প্রদর্শন-ব্যপদেশে যেন বাণভট্ট, নিজের কোন অপ্রার্থিত মহর্ষিপ্রতিম অধ্যাপকের আশ্রয়-প্রাপ্তি অতীব নিপুণতার সহিত প্রকটিত করিয়াছেন।

হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদভাব স্বভাবতঃই অতি করুণ ভাষায় প্রকাশ পায়, তাহার উপর "বাণের কলম"। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কাব্য বুঝিতে হইলে কবিকেও চেনা চাই।

দার্শনিক তত্ত্ব

তিনি কেবল ইতিহাস লিখিয়াই উক্ত কাব্য শেষ করেন নাই; সাহিত্যে যাহা কিছু চাই, একাধারে সকলেরই সুসমাবেশ করিয়াছেন। তিনি "জন্মান্তরবাদ"টি নখ-দর্পণের ন্যায় দেখাইবার জন্যই যেন স্বর্গবাসি-মহর্ষি শ্বেতকেতু-তনয় পুণ্ডরীককে শুকনাসমন্ত্রীপুত্র বৈশম্পায়ন ও শুকশিশুরূপে, চন্দ্রদেবকে চন্দ্রাপীড়,

জন্মান্তরবাদ

কপিঞ্জল ঋষিকে ইন্দ্রায়ুধ অশ্ব, চন্দ্রপত্নী রোহিণীকে তরলিকা এবং কমলবনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীকে মাতঙ্গকুমারীরূপে পুনঃপুনঃ তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যু দেখাইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মই যে জন্মান্তরের শ্রেষ্ঠানিকৃষ্টতার কারণ, তাহা স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন।

দার্শনিকতত্ত্ব

দর্শনের অতি নিগূঢ়তত্ত্ব জন্মান্তররহস্য সম্বন্ধে শ্রুতিতে দেখিতে পাই,—

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাবর মন্য সংযান্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং॥" (কঠশ্রুতিঃ -)

সর্ব্বোপনিষদের সার-সঙ্কলন গীতায় তাহাই স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই;—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" (৮ম অঃ, ৬ শ্লোঃ)

পুণ্ডরীক, মহাশ্বেতাবিরহে প্রাণত্যাগ করিয়া জন্মান্তরে ব্রাহ্মণ-মন্ত্রি-শুকনাস-পুত্র বৈশম্পায়নরূপে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া পরম পণ্ডিত হইলেও অচ্ছোদতীরে ব্রহ্মচারিণী মহাশ্বেতা-রূপানলে পতঙ্গবৎ পতিত হওয়ায় তৎশাপে তির্য্যক্ শুকপক্ষিরূপে পরিণত হয়; উহা মৃত্যুকালীন মনোভাবেরই প্রাক্তন-অভিব্যক্তি। তাই মহাকবি মাঘও বলিয়াছেন,—

"সভাব যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা।
পুমাং সমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি॥"

অতএব দেখা যায়, মৃত্যুকালের মনোভাব যে জন্মান্তরে প্রারব্ধ-কর্ম্মরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারে পরিণত হয়, এই দর্শনতত্ত্বটিতে উহা কেমন স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইয়াছে।*

দার্শনিকতত্ত্ব

বৈশম্পায়ন ও চন্দ্রাপীড়ের সূক্ষ্ম-দেহের উদ্গতিও এই তত্ত্বেরই সমর্থক। তাই পুরাণেও আমরা দেখিতে পাই,—

* এখানে গ্রন্থকার একটি ঢিল ছুড়িয়া দুইটি পাখী শিকার করিয়াছেন; ১টি—যোগবলের অপূর্ব্ব শক্তি, অপরটি প্রাক্তনসংস্কারের বলবত্তা।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষং তঞ্চকর্ষ বলাদ্ যমঃ।"

আবার যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি জাবালির, শুকশিশুর বিভিন্ন জন্মবৃত্তান্তবর্ণনে, পাতঞ্জল যোগদর্শনের বিভূতিপাদের অপূর্ব্ব তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

কুমার চন্দ্রাপীড়ের গুরুগৃহে বাস, সমাবর্ত্তন ও দিগ্বিজয়বর্ণনাদিতে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনেরই তত্তৎ অবস্থাবলী কৌশলে চিত্রিত হওয়াই স্বাভাবিক।

বিদ্যাজাতিবয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণমন্ত্রী শুকনাসের উপদেশরত্নাবলী, শুধু চন্দ্রাপীড়ের কেন, জগতের সকল শ্রেণীর জনগণেরই আদর্শনীতিরূপে সর্ব্বদা বরণীয়। বিশেষতঃ যৌবন-ধন-সম্পত্তি-প্রভুত্ব ও অবিবেকতাযুক্ত জনগণের পক্ষে সেই উপদেশগুলি মহৌষধ-স্বরূপ। স্বর্গবাসি-ঋষি-শ্বেতকেতু ও কমলবনাধিষ্ঠাত্রী কমলার ব্যভিচারোৎপন্ন "পুণ্ডরীক" অশেষ গুণসম্পন্ন হইলেও জন্মদোষে নীচপ্রকৃতি— এই বর্ণনায়, আর্য্যবিবাহবিধিলঙ্ঘনের কি বিষময় পরিণামই প্রদর্শিত হইয়াছে!

নৈতিক তত্ত্ব

কন্যান্তঃপুরবর্ণনচ্ছলে তাৎকালিক ক্ষত্রিয় রাজকুমারীগণের যৌবন-বিবাহ সমর্থিত হয়।

সমাজতত্ত্ব

হিন্দুস্ত্রীগণের সহমরণ অথবা চিরব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, এই শাস্ত্রীয় বিধিদ্বয়ের সমর্থনই তাৎকালিক প্রচলিত বিধি ছিল,—উক্ত গ্রন্থ হইতে কাদম্বরী-সান্ত্বনাচ্ছলে তাহা দেখা যায়।

তখন জলপথে হিন্দুমতে দেশান্তরে যাতায়াত ছিল, তাহাও অনুমান করা যায়।

হিন্দুমতে সিন্ধুযাত্রা

মহাশ্বেতার রূপবর্ণনপ্রসঙ্গে "শ্বেতদ্বীপবাসিদের ন্যায় শুভ্র" বর্ণনায় পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সাক্ষাৎ, অন্ততঃ পরিচয় ছিল, তাহার স্পষ্টই প্রতীতি হয়।

পাশ্চাত্য-জাতি-পরিচয়

বাণভট্ট তদীয় হর্ষচরিতে কালিদাসের প্রশংসাচ্ছলে লিখিয়াছেন,—

"নির্গতাসু নবাকস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতি মধুর সান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্টিব জায়তে।"

কালিদাসের পরবর্ত্তিত্ব

ইহা হইতে কালিদাস যে, বাণের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

সোমদত্ত প্রণীত কথাসরিৎসাগরের একটি সাধারণ গল্প এই অপূর্ব্ব আখ্যায়িকার আদর্শ।

গ্রন্থের আদর্শ

মহাশ্বেতার যোগাবলম্বন স্বার্থমূলক, পতির জীবনলাভই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, তাই মহাশ্বেতা সকাম সাধিকা, কিন্তু কাদম্বরীর প্রথম কৌমার্য্যব্রতাবলম্বন সম্পূর্ণ পরার্থমূলক— সুহৃৎ-সহানুভূতির চরমাদর্শ—তাই কাদম্বরীতে কাদম্বরীরই শ্রেষ্ঠতা।

গ্রন্থের নামকরণ

পূর্ব্বার্দ্ধ রচনার পরেই বাণভট্টের মৃত্যু হইলে তদীয় কৃতী পুত্র ভূষণভট্ট পিতৃ-কীর্ত্তি সম্পূর্ণ করিবার জন্য পরার্দ্ধ সমাধান করেন;— এই জন্যই বলে—"পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং।"

গ্রন্থবিষয়

উপসংহারে বক্তব্য, এই উপাখ্যানপ্রসঙ্গে বিবিধ ইতিহাস, পুরাণ, দোষ-গুণ ও অলঙ্কারের এতাদৃশ যুগপৎ সমাবেশ আর কোন গ্রন্থেই প্রদর্শিত হয় নাই। নিসর্গবর্ণন পাঠকালে যেন সত্যসত্যই কিম্পুরুষবর্ষে সেই গন্ধর্ব্ব-রাজ্যে উপস্থিত প্রতীতি হইবে—পৌরাণিক প্রসঙ্গে যেন কোন শাস্ত্রগ্রন্থের আবৃত্তি হইতেছে—অলঙ্কার-আলোচনাকালে যেন সমুদয় অলঙ্কার শাস্ত্রের একত্র সমাবেশ প্রতীতি হইতেছে—অথচ দ্বিরুক্তি বা অত্যুক্তি নাই—বরং ভাবগাম্ভীর্য্যে অপূর্ব্ব শ্রী দেখিতে পাইবেন।

যে মহাত্মগণ, সামান্য উপাখ্যানেই এতাদৃশ সর্ব্বাদর্শ চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন চরিত ও গ্রন্থাবলী, তদ্গত চিত্তে পাঠ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের অনেক ঘরের খবর জানিতে পারিব। ভগবন্, কত দিনে আমাদের সে চক্ষু ফুটিবে ?

শ্রীবাসুদেব শর্ম্মা

ইউরোপীয় আর্ম্মেণিয়ায় হিন্দু উপনিবেশ

(সংক্ষিপ্তসার)

অতি প্রাচীন কাল হইতে জগতে হিন্দুগণ জ্ঞান গরিমায় এবং প্রাধান্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষের বহির্ভাগেও হিন্দুগণের গতিবিধি বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ বহুস্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল যে তাঁহারা বাণিজ্য-ব্যপদেশেই ভূমণ্ডলের বিবিধ স্থানে গমনাগমন করিতেন, তাহা নহে। অতি পুরাকালে মহাভারতের যুগে অর্জ্জুন প্রভৃতি মহারথিগণ স্বীয় প্রাধান্য জগতীতলে অক্ষুণ্ণকরণমানসে দিগ্বিজয়-ব্যপদেশে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রবলপরাক্রান্ত নরপতিগণ সকাশে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধ-ঘোষণা করিতেন। এই প্রকারে তাঁহারা ভারতবর্ষ, এসিয়া, ইউরোপ, সুদূর আমেরিকা, চীন, কর্কটক্রান্তি সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসকল, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সন্নিহিত দেশ সমূহ, অধুনা যাহা মনুষ্যের অনধিগম্য, সেই সমুদায় স্থলেও তাঁহারা অভিযানে নিরত হইতেন, এবং পৃথিবীর সমগ্র প্রবলপরাক্রান্ত নরপতিকে সমরে পরাভূত করিয়া স্বয়ং মহারাজ চক্রবর্ত্তীর প্রতিনিধিস্বরূপে পাণ্ডুক রাজন্যবর্গের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন। এইগুলি হইল রাজ্যসম্বন্ধে কথা। অধিকন্তু, ভারতবাসী ভারতবর্ষের বহির্ভাগে কেহ যে সেনাপতি, কেহ যে সৈনিকপুরুষরূপে কার্য্য করিতেন, তাহা বোধ হয়, অনেকেই অবগত নহেন। পূর্ব্বে পারস্যরাজ ডেরিয়াসের অধীনে বহু সহস্র হিন্দুসৈন্য নিযুক্ত ছিল। তাহাদিগকে বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। প্রাচীন কালে পারস্যরাজ ডেরিয়াসের সহিত যখন গ্রীসদেশের যুদ্ধারম্ভ হয়, তখন ভারতীয় হিন্দু সৈন্যগণ গ্রীসে গমন করিয়া অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় ইতিহাসপাঠকমাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন। এইরূপ কিম্বদন্তী যে, যে সময়ে রোমের প্রবল প্রতাপে ইউরোপ কম্পমান হইতেছিল, জুলিয়স্ সিজর

জগৎময় হিন্দু

যে সময়ে বিস্থাবত্তা এবং রণ-পাণ্ডিত্যে ইউরোপে অদ্বিতীয় বীরপুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন, তখন ভারতবর্ষের বহু হিন্দু অশ্বারোহী রোমরাজ্যের সৈন্যদলভুক্ত ছিল। যখন রোমবাসিগণ বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ বৃটনাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তদীয় উপখাত অতিক্রম-পূর্ব্বক বৃটনদ্বীপে রোমীয় বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তখন বহু সহস্র ভারতীয় হিন্দু শান্ত্রী রোমবাসীর পক্ষ হইতে ইংলণ্ড রক্ষা করিত। সিসেষ্টার নামক স্থানে তাহাদের প্রধান 'কটক' ছিল। মহারাজ অশোকের সময়ে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্তান নামক দেশ দুইটিও তাঁহার করতলগত ছিল। অপিচ, এক সময়ে ইউরোপীয় রুষের অন্তর্গত কম্পীয়ান সাগরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে হিন্দুরাজ্য বিদ্যমান ছিল। এই সকল বিষয় বহু প্রাচীন যুগের কথা। খৃষ্টীয় সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান আর্ম্মেণিয়ায় হিন্দু উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমরা অধুনা তাহার বিবরণ নিম্নে প্রকটিত করিব।

আর্ম্মেণিয়ার হিন্দুগণের আকৃতি

আর্ম্মেণিয়ায় হিন্দুগণের আবির্ভাবের বিবরণ বিস্ময়াবহ। তাহারা কৃষ্ণকায়, লম্বকেশ, কুৎসিত এবং নয়নের অপ্রীতিকর ছিল।*

দেমিত্র ও কৈশণী নামক ভ্রাতৃদ্বয় ভারতের রাজপুত্র ছিলেন। তাঁহাদের দেশত্যাগের বিবরণ এই প্রকার :—উক্ত উভয় ভ্রাতা দিনাক্ষি নামক নরপতির বিরুদ্ধে বিশেষ ষড়যন্ত্রে

ভারতবর্ষ ত্যাগ

বিনিযুক্ত ছিলেন। রাজা দিনাক্ষি উক্ত রাজপুত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া ষড়যন্ত্রকারিদ্বয়কে গুপ্তহত্যা অথবা চিরনির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করেন।

উভয় ভ্রাতা গুপ্তচরমুখে রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বে স্বদেশ ত্যাগকরতঃ বলশকের (Valarsaces) রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি উভয় ভ্রাতার শিষ্টাচারে

রাজপুত্রদ্বয়ের প্রাণদণ্ড

এবং প্রীতিভায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া তরণদেশের রাজ্য প্রদান করেন। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের সমভিব্যাহারে বহু হিন্দু অনুচর আগমন করিয়াছিলেন। রাজপুত্রদ্বয় ভাসপ (Vishap) নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাঁহাদিগের অনুচরবর্গ ও হিন্দু ঔপনিবেশিকগণকে তথায় বসবাসের আদেশ প্রদান করেন।

তাঁহারা যথাকালে প্রধান আর্ম্মেণিয়ার "অষ্টশত" নামক স্থানে শুভাগমনকরতঃ ভারতের দেবদেবী প্রভৃতির মূর্ত্তি সুরম্য মন্দিরাদিতে সংস্থাপিত করিয়া যথানিয়মে অর্চ্চনা-তৎপর হই-

তিন পুত্র

লেন। এইরূপে তথায় পঞ্চদশবর্ষ অতিবাহিত হইলে পর উক্ত রাজভ্রাতৃদ্বয়ের তদ্দেশের রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ড হয়। সেই নরপতি কৃপাপরবশ হইয়া উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের পুত্রগণের মধ্যে উক্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। তাঁহাদের তিনটি পুত্র সন্তান ছিল—(১) কুয়ার, (২) মেঘতি এবং (৩) হোঁরাই।

* Johannes Advall Esq. M. A. S. observes :—The Hindus of Ancient Armenia had a most extraordinary appearance. They were black, long-haired, ugly and unpleasant to the sight &c.

প্রতিষ্ঠিত গ্রাম পরিত্যাগকরতঃ তাঁহারা কারকী নামক অতি মনোরম অরণ্যশোভিত উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর গিরিপৃষ্ঠে বসবাস করিতে লাগিলেন। মানব-সুখোপযোগী বিবিধ বনৌষধি ও বৃক্ষরাজিপরিপূরিত এবং মনোহর বস্তানচয়ে তত্রস্থল সমাকীর্ণ ছিল। তত্রস্থল তাঁহারা গগণস্পর্শী হর্ম্ম্যমালায় পরিশোভিত করিলেন।

এই সুদৃঢ় ও মনোহর নগরীতে তাঁহারা ভারতীয় দুইটি উপাস্য দেবতা'র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতাত এবং পিতার নামে উক্ত দুইটি মন্দির উৎসর্গ করা হইল।

এই সময়ে তথায় রাজাদেশে যাজকগণ কেহ দীর্ঘ কেশ ধারণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের সন্তানগণের কেশ-পারিপাট্যের ত্রুটি হইত না। রাজা তাহাতে কোন আপত্তি করিতেন না।

বর্ত্তমানকালের ভারতীয় হিন্দুগণের ন্যায় উক্ত ঔপনিবেশিক হিন্দুগণের ক্রিয়াকলাপ সমতুল্য ছিল। মূর্ত্তি-পূজা, বর্ণে সমতা, ক্রিয়াকাণ্ড, ধর্ম্মপ্রবণতা প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপারেই উক্ত প্রাচীন আর্ম্মেনিয়ার হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ ভারতবর্ষের হিন্দুগণের সমমতাবলম্বী ছিলেন।

জেনোবিয়াস্ (Zenobius) নামে জনৈক ব্যক্তি আর্ম্মেনিয়াদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইয়াকনিয়ান বা নবউৎসের ভজনাগারের বিসপ বা যাজক ছিলেন। উক্ত স্থান সিরিয়া প্রদেশের অন্তর্গত। তিনি বহুবর্ষ আর্ম্মেনিয়ায় বসবাস করেন, সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি আর্ম্মেনিয়ার হিন্দু-ঔপনিবেশিকগণের সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রদান করিয়াছেন—ভারতবর্ষ হইতে দেমিতর বা দেমিত্র ও কৈশনি নামে রাজপুত্রদ্বয় কোন ষড়যন্ত্রের অপরাধে স্বদেশ হইতে পলায়ন করেন। উক্ত ঘটনা খৃষ্ট-পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়া থাকিবে। কারণ ভালারসাস্ বর্ত্তমান তুরস্ক এসিয়ার মধ্যে পার্থিয়া নামক প্রদেশের নরপতি আরসাসের পৌত্র। প্রাগুক্ত নরপতি আরসাসের দুই পৌত্র ছিল।(১) মহানুভব আরসাস বা আরসাস্-দি-গ্রেট্ ও (২) ভালারসাস্। আরসাস্ পার্থিয়ার নরপতি ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র আরসাস্-দি-গ্রেট্ অতঃপর রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। তিনি রাজপদে আসীন হইয়াই কনিষ্ঠ সহোদর ভালারসাস্‌কে আর্ম্মেনিয়ার রাজপদ প্রদান করিলেন। উক্ত ভালারসাস্‌ই আমাদের আলোচ্য নরপতি। তাঁহার রাজ্যেই উক্ত ভারতীয় রাজপুত্রদ্বয় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের সময়-নিরূপণ

ভালারসাস্ কোন্ সময়ে আর্ম্মেনিয়ায় রাজত্ব করিতেন অধুনা তাহাই আলোচিত হইবে। ভালারসাস্ ৩৮৫২ আন্নোমুন্দীতে অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব সার্দ্ধ শতাব্দীতে আর্ম্মেনিয়ায় রাজত্ব করিতেন।* অতএব দেমিত্র ও কইশনি

উপনিবেশের সময়-নিরূপণ

* Zenobius' description :———Valarsacees reigned in 3852 Annomandy i. e. a century and a half before Christ.

ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক খ্রীষ্টীয় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে আর্ম্মেনিয়ায় উপস্থিত হয়েন। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা যথাপূর্ব্ব যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

একদা সেণ্টগ্রেগরী পরিজ্ঞাত হইলেন যে তারন বা তরনপ্রদেশে দুইটি হিন্দুমন্দির বিরাজমান রহিয়াছে। এতচ্ছ্রবণে সেণ্টগ্রেগরী তথায় গমন করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। যথাসময়ে তিনি সদলবলে পালুনিস্ প্রদেশে গমন করিয়া সুবৃহৎ গণ্ডগ্রাম কাইশনির সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। উক্ত কাইশনি গ্রাম বিখ্যাত কুয়ার্স নগরীর সন্নিকটেই অবস্থিত। তথায় তাঁহার কতিপয় সাকারবাদী যাজকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা উক্ত খৃষ্টান যাজকের বাক্য শ্রবণে কোন প্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। অপিচ খৃষ্টান যাজকের কতিপয় বাক্যে সন্দিহান হইয়া তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রজনীযোগে হিন্দু যাজকগণ সমূহ বিপদের কথা স্মরণ করিয়া মন্দির-মধ্যস্থ সমগ্র ধনরত্নাদি গ্রহণপূর্ব্বক গুপ্তস্থানে রক্ষা করিলেন, তাঁহারা অষ্টিশতের যাজকগণকে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা বিজ্ঞাপিত করিলেন। যাজকগণ এই প্রকার বিপত্তি শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানপ্রকল্পে যত্নবান হইলেন। তাঁহারা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় অনতিবিলম্বে সৈন্য-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। সৈন্য সংগৃহীত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিতরূপ বাক্যে প্রোৎসাহিত করিলেন।—"হে সৈন্যগণ, আগামী কল্য রাজা কাইশনির সম্মানরক্ষার্থে তোমরা সামর্থ্যানুসারে নিশবদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইও। ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে জীবন বিসর্জ্জন করিলে ধরাধামে অক্ষয় কীর্ত্তি অব্যাহত থাকিয়া যায়। এক-মাত্র ধর্ম্মই সঙ্গে গমন করিবে।—অপর কোন বস্তুই সঙ্গে গমন করিবে না।" সৈন্যগণ এতচ্ছ্রবণে প্রোৎসাহিত হইয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তথাকথিত কুয়ার্সের অধিবাসি-গণ গভীর অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত থাকিবে এবং শত্রুগণ সম্মুখীন হইলেই তাহাদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে। অধিকন্তু খৃষ্টানগণকে প্রহার করিবার মানসে অরণ্য মধ্যে কতিপয় দস্যু লইয়া যাইবে।

তরনে হিন্দুরাজ্য · *হিন্দু যাজকগণের বিপত্তি* · *যুদ্ধের পরামর্শ*

তত্রস্থলের যাজক-পতি অর্জা এবং তাঁহার পুত্র দেমিত্র কুয়ার নামক স্থানে সম্মিলিত হইলেন। তিনি সম্মিলিত সৈন্যগণের অধিনেতা হইয়া সৈন্য-পরিচালনাদি করিবেন স্থিরীকৃত হইল। যথাসময়ে শিবির সংস্থাপিত হইল। অপরস্থানের সৈন্যগণ তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার বাসনায় তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরদিন তাঁহারা এই সুবিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া পর্ব্বতের পাদদেশে শত্রুগণকে প্রলুব্ধ করিবার মানসে মন্থর গতিতে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

অর্জা সেনাপতি

সেণ্টগ্রেগরী আরস্তনিজের রাজপুত্র, আঙ্গিভেজিজের রাজপুত্র, আবেল রাজপুত্রের সৈন্য-গণের সহিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল সমভিব্যাহারে বেলা তৃতীয় প্রহরে পর্ব্বতারোহণ করিতে

আরম্ভ করিলেন। অদূরেই অরজাঁ জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। শত্রুগণ কোন্ স্থানে লুক্কায়িত আছে, তাহা খৃষ্টানগণ অবগত ছিল না। শত্রুগণ অরণ্যের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেই অরজাঁ ও দেমিত্র প্রবলবেগে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। তৎক্ষণাৎ ভেরী নিনাদিত হইল।

যুদ্ধারম্ভ

তখন উভয় পক্ষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিল। খৃষ্টান রাজগণ ইহাতে যথার্থ শিক্ষা প্রাপ্ত হইল। তাহাদের অশ্ব পলায়মান হইল। ভয়-চকিতে অশ্বগুলি হ্রেষারবে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত করিতে লাগিল। তাহাতে সৈন্য-শ্রেণী ভয়বিহ্বলে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। আঙ্গেলের রাজপুত্র তখন সুইনীজ রাজকুমারকে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন, আপনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখুন, আক্রমণকারী শত্রুগণ বাস্তবিকই কি উত্তর দেশের রাজকুমারের সৈন্য। তিনি (আঙ্গেল-রাজপুত্র) ক্ষণকাল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া উত্তর-প্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন প্রত্যুত্তরই প্রাপ্ত হইলেন না। সুইনীজ রাজকুমার সেণ্ট গ্রেগরীকে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। "শত্রুগণ খৃষ্টানগণের উপর অধিকতর বিরক্ত হইয়া একটা অঘটন ঘটাইবে। তখন কিন্তু আমাদের উৎপীড়নের অন্ত থাকিবে না—ঘৃণায় মুখ প্রদর্শন করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে।" অধিকন্তু তিনি বলিলেন, "জনৈক বিশ্বস্ত এবং বিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা আমাদের সৈন্যগণকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সঙ্কেত করা হউক। কারণ শত্রুসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে প্রবল। তাহাদের বিপুল বাহিনী আমাদের ভয়োৎপাদন করিতেছে। তাহাদের বহুশত পতাকা গগনমার্গে উড্ডীন হইতেছে, উপলব্ধি হয়।"

যথাকালে প্রস্থান-সঙ্কেত প্রদান করা হইলে আঙ্গেল বংশের রাজপুত্র সেণ্টগ্রেগরীকে মকের রাজপুত্রের সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। তিনি অধিকন্তু আদিষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে শত্রুপক্ষ অলকান প্রাসাদে লইয়া যাইবে। পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশে মক ও সেণ্টগ্রেগরী ক্রমশঃ

অলকান দুর্গ অবরোধ

অবতরণ করিতে লাগিলেন। তথা হইতে তাঁহারা কুরাসকে দর্শন করিতে গমন করিবেন, স্থির হইল। তাঁহারা অলকান দুর্গে উপ-স্থিত হইলে উক্ত দুর্গ খৃষ্টান সৈন্যদ্বারা অবরুদ্ধ হইল। আঙ্গেলরাজকুমারের অধীনে তখনও

কুরাস অবরোধ

চারিসহস্র সৈন্য। তিন দিনের অবরোধে কুরাস শত্রু-হস্তগত হইল। সহরের সমগ্র প্রাচীরগুলিই ভগ্ন হইল এবং গৃহাদি ভূমিসাৎ করা হইল। পলায়মান সহরবাসিগণকে তরবারির আঘাতে শমন সদনে প্রেরণ করা হইতে লাগিল। যথাকালে খৃষ্টান-রাজগণ পর্ব্বতারোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অরজাঁ ও তাঁহার সহচরবৃন্দ অন্যূন চারিশত সৈন্যসহ শত্রু সৈন্যের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তদনন্তর ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। আর্ম্মেনিয় সৈন্যগণ রণভেরীর শব্দে পর্ব্বতোপরি সমবেত হইল। অরজাঁ তখন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "রে পাপাশয় শত্রুগণ, এইবার অগ্রসর হও।" আরজুনীকের রাজপুত্র এতচ্ছ্রবণে তড়িৎবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন, "যতদিন

তোমরা স্বদেশ উদ্ধারকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া থাক, তবে নিতান্ত অর্ব্বাচীনের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, যেহেতু তোমাদের তদ্রূপ সামর্থ্য দেখিতেছি না। অবলোকন কর, আঙ্গেল ও লুইনীজবংশের রাজকুমার এবং তোমাদের পরিচিত অন্যান্য উচ্চবংশীয় ব্যক্তিবৃন্দ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছেন। "তচ্ছ্রবণে অরজা বা আরজান পুত্র দেমিত্র উত্তর করিলেন, "হে আর্মেন রাজকুমারগণ! আমাদের যদ্যপি সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাও বাঞ্ছনীয়, তথাপি ফেরুপালের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা নিতান্ত অযৌক্তিক। অধিকন্তু, তোমরা দক্ষিণ আর্ম্মেনিয় প্রদেশের উচ্চবংশোদ্ভব ব্যক্তিবৃন্দ। তোমাদের ধনবল ও জনবল অধিক, তথাপি আমরা যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইব না, একথা ধ্রুব সত্য। আমরা স্বগৃহাদি সংরক্ষণার্থ প্রাণপণে যত্নবান হইব। অপিচ, আমাদের নয়ন-সমক্ষে দেবমন্দিরাদি অপবিত্র হইবে এবং দেবমূর্ত্তি বিধ্বংস হইবে, তাহা আমরা প্রাণান্তেও সন্দর্শন করিতে পারিব না।" এই প্রকার বীরোচিত বাক্য আরোপ করিয়া দেমিত্র আঙ্গেল বংশের রাজকুমারকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আঙ্গেলরাজপুত্রও তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে ত্রুটী করিলেন না। আরজন বিদ্যুৎ বেগে তদীয় শত্রুর জঙ্ঘাদেশে বল্লম নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিতেছেন, ইত্যবসরে চতুরগতি যুদ্ধবিশারদ আঙ্গেল তাহা হইতে মুক্ত হইলেন। অতঃপর তিনি আরজনকে বলিলেন, 'আরজন! এই বার মদীয় প্রহার সহ্য কর।' এই বলিয়া হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা তাহার স্কন্ধে আঘাত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তদীয় মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইল। সেই স্থানকে তদবধি লোকে "আরজন" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

আরজন নিহত

দেখিতে দেখিতে দেবোপাসক সৈন্যগণের সংখ্যা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাহারা পূর্ব্বোক্ত পরাজয়ে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। বিশপনগরের যাজকগণ প্রেরিত সৈন্যদল পূর্ব্বোক্ত সৈন্যদলের সহিত অবিলম্বে সম্মিলিত হইল। অধিকন্তু, পারতক্ মেঘতি, আস্ত্রাখানের জনগণও সৈন্যদলে আসিয়া সংযোজিত হইল। এই প্রকারে এক সহস্র পঞ্চশত পঞ্চাশৎ ব্যক্তি প্রাগুক্ত স্থলে সমবেত হইল। গিরিশৃঙ্গোপরি অতঃপর উভয় সৈন্যদল মধ্যে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। যাজকগণ কালবিলম্ব না করিয়া আর্ম্মেনিয়ার সৈন্যগণের উপর করকাপাতবৎ নিপতিত হইলেন। তখন আর্ম্মেনিয় সৈন্যগণ বাধ্য হইয়া গিরিপাদদেশে পলায়ন করিতে লাগিল। তথা হইতে তাহারা কোন সুদূর পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল, পল্লীবাসিগণ অরণ্য মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। শত্রু সৈন্যের গতিরোধ-জন্য তাহারা শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হইল। অত্যল্পকাল মধ্যে তাহারা শত্রু-সৈন্য ধ্বংস করিয়া ফেলিল। পরন্তু আঙ্গেলরাজপুত্র যাজকগণের সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। দেমিত্র তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। এই প্রকারে পর্ব্বতের উপর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার উপক্রম হইল। খৃষ্টান সৈন্যদলপতিগণ অপর সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল। তখনও মেঘতির সহিত চারি সহস্র বেসিল ও হার্কের সঙ্গে তিন সহস্র সৈন্য বিদ্যমান ছিল। তাহাদের অবশিষ্ট সৈন্য নগরধ্বংসও

আস্ত্রাখানের জনগণ সংমিলিত

ময়দানের শস্যাদি সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই রজনী সমাগতা হইলেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্যদলই তত্রস্থলে শিবির সংস্থাপন করিয়া রাত্রি যাপন করিল অতি প্রত্যূষেই যুদ্ধারম্ভ হইবে স্থির হইল।

পরদিন প্রত্যূষে আর্ম্মেনিয়ার সৈন্যদল নয়নপথে পতিত হইল। তিরকতার নগর হইতে আনুমানিক অর্দ্ধ-সহস্র সৈন্য যাজকগণের সঙ্গে সম্মিলিত হইল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যদলই ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইল। যাজকগণের সৈন্যসংখ্যা অনুমান ছয় সহস্র নয় শত পঁয়তাল্লিশ। আর্ম্মেনিয়ার সৈন্যসংখ্যা কেবলমাত্র অনুমান পঞ্চসহস্র আশি জন। অবিলম্বে ভেরী নিনাদিত হইল। উভয়পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথম দেবোপাসকগণই পরাজিত হইবেন, এই প্রকার উপলব্ধি হইল। হাষ্টেন্‌স-রাজকুমার পূর্ব্বে দেমিত্রের বিপক্ষদলভুক্ত হইয়া এক্ষণে আর্ম্মেণিয় সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার পরিতাপ উপস্থিত হইল এবং তাহাতেই তাঁহার অভিমত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি পূর্ব্বোক্ত দল পরিহারপূর্ব্বক দেবোপাসকগণের দলে সপ্ত শত সৈন্য লইয়া সম্মিলিত হইলেন। এই প্রকারে আর্ম্মেনিয়গণ এক জন ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে বঞ্চিত হইলেন। ইহাতে তাহাদের সৈন্য মধ্যে একটা শঙ্কা বা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। উক্ত সেনাপতিকে বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহারা স্বীকার করিত।

ক্ষণকালপরে উভয়পক্ষে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল। তখন রাজলক্ষ্মী দেবোপাসকগণেরই অঙ্কশায়িনী হইলেন। হিন্দুগণ যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। অতিশয় কোন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাতেই তাহাদের পতনের মূল হইল। তাহাদের সেনাপতি ও সৈন্যগণ আমোদ-প্রমোদে মত্ত রহিল। ভবিষ্যৎ বিপদের কথা একবারে বিস্মৃত হইলেন। শত্রুপক্ষীয়গণ অবগত হইল যে হিন্দু-সেনাপতি ও সৈন্যগণ আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়াছে। এই সুযোগে তাহাদের আক্রমণ করিলে সুফল ফলিতে পারে। অতএব তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে হিন্দুবাহিনীর উপর নিপতিত হইল। ফল যাহা হইল, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। দ্বন্দ্বযুদ্ধারম্ভ হইল।

হিন্দুগণের জয়লাভ

সনীজের রাজকুমার তরবারি দ্বারা হিন্দু সেনাপতির মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত করিলেন। এই ঘটনা ইনাকনিয়াণের বিপরীত দিকে সংঘটিত হয়। শত্রুপক্ষে হার্টন্‌সের রাজকুমারও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন।

শত্রুপক্ষের কৌশল

এইবার আর্ম্মেনিয় সৈন্যগণ বিজয়োৎফুল্ল হইল। তখন আরজুনীজের রাজপুত্র আনন্দে অধীর হইয়া অষ্টিশত ও মেতাকের প্রধান যাজককে আক্রমণ করিলেন। যাজক আরজুনীজের রাজপুত্রের উরুদেশে ভীষণ আঘাত করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় আঘাতে যাজকের স্কন্ধ হইতে শির ভূমিতলে পাতিত করিলেন। সেই স্থানকে অধুনা মেটসাকল বলিয়া থাকে। আরণীস্ রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া বনবাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহার আর বনবাসী হইতে হইল না। আরজুনীজের রাজপুত্র তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিহত করিলেন।

সেই বন প্রদেশ হইতে তিনি আরগীস রাজকুমারকে হত্যা করিয়া দেমিত্রকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়া দেমিত্রকে দক্ষিণস্কন্ধে তরবারির আঘাত করিয়া নিহত করিলেন। দেমিত্র স্বীয় হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে মকসের রাজকুমারের ইতঃপূর্ব্বে শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং নিহত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে আর্ম্মেনিয়ার হিন্দুগণের পরাজয় ও পতন হয়। আর্ম্মেনিয়ার রাজপুত্রগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু মকসের রাজকুমারের শোচনীয় মৃত্যুতে সে জয় বিষাদে পরিণত হইল। আর্ম্মেনিয়ার দেশব্যাপী একটা শোকোচ্ছ্বাসের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইল।

দেমিত্র নিহত

মকসের রাজকুমার নিহত

দেমিত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অবসান হইল এবং শোণিতপাত নিবারিত হইল। সইনীজ রাজপুত্রের আদেশে চতুর্দ্দিকে শান্তির ভেরী নিনাদিত হইল। যে সকল হিন্দুযাজক যুদ্ধাবশেষে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আর্ম্মেনিয়ার রাজকুমারগণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হিন্দুগণের সৎকার করিলেন। উভয়পক্ষে বহু সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

খৃষ্টানগণের শেষ জয়

হিন্দুগণের সৎকার

প্রখ্যাতনামা যাজকগণের স্মৃতি-রক্ষার্থ স্তম্ভ প্রস্তুত হইল। আরজনের স্মৃতিস্তম্ভের উপর নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা আর্ম্মেনিয় ভাষায় লিখিত। আমরা কেবল উহার অনুবাদমাত্র প্রদান করিলাম।—

"প্রথম যুদ্ধ ভয়ঙ্কররূপে আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দুগণের প্রধান যাজক আরজনই সমগ্র সৈন্যের অগ্রণী (সেনাপতি) ছিলেন। তাঁহার এইস্থলে মৃত্যু হইয়াছে। তৎসঙ্গে তদীয় অনুচরের মধ্যে এক সহস্র আটত্রিশ জন ধরাশায়ী হইয়াছিল। একদিকে কৈশনী ও অপরদিকে বিশুর জন্য সমর আরম্ভ হইয়াছিল।"

সেনাপতির স্মৃতিস্তম্ভ

এই যুদ্ধের পর হইতে আর্ম্মেনিয়ায় হিন্দুপ্রাধান্যের অবসান হয়।

হিন্দুপ্রাধান্যের অবসান

শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ

সংস্কৃত নাটকে নানান্ ভাষা

কবি গাহিয়াছেন—"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা। বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা॥" ভাষার ভিতর দিয়াই মায়া-মমতার, প্রীতি-বিশ্রম্ভের স্রোত বহিয়া যায় বলিয়াই সমাজবদ্ধ মানবজাতির মধ্যে স্ব-ভাষার প্রতি এত হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরাগ। তাই বৈদিক যুগের প্রবীণ প্রাতিশাখ্যকার হইতে বর্ত্তমান যুগের নবীন ভাষাতত্ত্ববিদ্ পর্য্যন্ত সকলেরই স্বভাষা (স্বকীয়

dialect) তাহার সূক্ষ্ম স্থূল, সকলরূপ বিশেষত্ব টুকু লইয়া এত আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা ! কাজেই স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, নানান্ দেশের নানান্ ভাষা লইয়া, নানান্ সাহিত্যিক-রীতির বিচিত্র সূত্র-সমবায়কে নানান্ ভাবে ধোলাই করিয়া, যে সাহিত্যশিল্পী, সুদূর অতীতে তাহাদের সাহায্যে এক অভূতপূর্ব্ব সাহিত্য-সতরঞ্চ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি কি প্রকৃতির রীতির বিপর্য্যয়-সাধন করিয়াছিলেন, অথবা ভাব-জগতে উদ্ভট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন ? এ প্রশ্নের উত্তর সাহিত্যের ইতিহাসের অনুসন্ধানে মিলে এবং সে উত্তর, আপাততঃ বিচিত্র বলিয়া মনে হইলেও, এক বই দুই নহে, সঙ্গত বই অসঙ্গত নহে। দক্ষ শিল্পী তাঁহার পরিণত কারু-কলা লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন, প্রকৃতির মূলতত্ত্ব সূক্ষ্ম-শিল্পে অনুস্যূত ছিল, তাই নানান্ দেশের নানান্ ভাষা দিয়া, নানান্ জনপদের নানান্ উপাদান দিয়া সাহিত্যে এক সুদৃঢ় মর্ম্মর-প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল !

আমরা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের কথাই বলিতেছি। নাটকে নানান্ ভাষার প্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধন করার, বহুকে একের অঙ্গীভূত ও অনুগামী করার, জনপদ-পাতিকে সার্ব্বভৌম-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ভার সংস্কৃত-সাহিত্যের সাহিত্যিকের উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল—সে ভার সুসম্পন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের এ বিশেষত্ব অনন্য ও অননুকরণীয় হইয়াছে। অবশ্য, নাট্যসাহিত্য বলিয়াই এতদূর নূতনত্ব প্রবর্ত্তন দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।* নাটকে ঘটনা-পরম্পরার, কর্ম্মশক্তির একটা অবাধ অপ্রতিহত গতির প্রয়োজন ; গীতিকাব্যে ভাবের দানা জমাট হইয়া বাঁধিতে পারে, ও বাঁধিয়া থাকে, মহাকাব্যের চরিত্র-সম্পদে আদর্শ-জগতের একটা বিশ্বাতিগ, অবাস্তব বাষ্পময়ত্বের সন্ধান মিলে। এক নাট্য-সাহিত্যেই ঘটনাজালের ও পাত্রবর্গের ভিতর দিয়া জগৎ-প্রাচিনী কর্ম্ম-ধারার এক তরল স্বচ্ছ বাস্তব খরস্রোত অবিরত প্রবাহিত। বৈচিত্র্য লইয়াই জীবনী-শক্তির সত্তা ও স্থিতি—আর রূপকে জীবনের তত্ত্বের রূপণ। তাই সংস্কৃত নাটকে নানান্ ভাষার বিচিত্র সমন্বয়, ভাবের পটে উজ্জ্বলে-মধুরের অপূর্ব্ব রেখাপাত, পাত্র-বৃন্দের বিশ্বব্যাপী ঘনিষ্ঠ সমাবেশ। নাটক-প্রকৃতির এমন নিখুঁত নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া সংস্কৃত নাট্যকার সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার কঠিন-কঠোর মিলনে অঘটন-ঘটন-পটু হইয়াছেন—আর এ অঘটন-ঘটন-পটুত্ব মায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

একথাও বলা যাইতে পারে, সংস্কৃত-নাটককার এমন নূতন কিছু করেন নাই। মানব-জাতির সারা নাট্য-সাহিত্যেই নাটক-প্রকৃতির অনুকূল ও মূলীভূত ভাষার তারতম্য, ইতর-বিশেষ বজায় রহিয়াছে। প্রতীচীর নাট্য-সম্রাট্ শেক্স্‌পিয়ারের নাটকাবলীর ভাষার বিশ্লেষ কর, দেখিবে এ ভাষার তারতম্য সেখানেও বর্ত্তমান। বিশেষতঃ যেখানে বাস্তব-জীবনের ঘটনায় নিত্য-নব ঘাত-প্রতিঘাত, সেখানে পাশ্চাত্য-কবির ভাষা এক হইলেও বহুঃ

* নাট্য-সাহিত্যের অবাধ স্বীয় প্রকৃতির কথা 'সংস্কৃত নাটকের জন্ম-কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে কিছুকাল পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের কতক কতক স্থানের প্রমাণ-প্রয়োগ-বিহীন উক্তিও উল্লিখিত প্রবন্ধের সহিত মিলাইয়া দেখিলে সরল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

বহুতর।(১) অস্বস্থ-মস্তিষ্ক-চাপল্য-সরল টম্ বটমের ভাষা, আদরিণী সোহাগিনী গরবিণী পরী-রাণী টাইটানিয়ার ভাষা হইতে মূলতঃ বিভিন্ন—নৈরাশ্যখিন্না আত্মাভিমানিনী রাজবধূ Constance কর্ম্মকুশল স্বভাবচপল Faulconbridge এর ভাষায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই,—ধীরোদাত্ত সহৃদয় ডেনমার্ক-রাজকুমারের চিত্তভার লঘু করিতে কবিত্বের ভাষার ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, সমাধিস্থানে সমবেত চপল-প্রকৃতি চেটবিট সে ভাষায় বাস্তবরাজ্যে কথা কহিবার সুযোগ পায় না। অথবা এত দূরের কথা কেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করা যাউক—সেখানেও ঐ একই তত্ত্বের সন্ধান মিলিবে। প্রগল্ভ রাজকবি রায়-গুণাকরের অপূর্ব্ব-সৃষ্টি চণ্ডী নাটকের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই যাউক, 'নাটুকে নারায়ণ'(২) হইতে নবীন নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেরই নাটকে ভাষার বৈচিত্র্য বহুরূপীত্ব, রকম-ফের মিলে। এটির অভাবে ভাষা পঙ্গু ও অসাড় হইয়া পড়ে, ভাব-ক্লেশ ও জড়তার অবসাদে মুহ্যমান হয়, চরিত্রগত বিকাশের হানি ঘটে। কাঙ্গালের রাজবসন শোভা পায় না;—সংস্কৃত আলঙ্কারিকের তথাকথিত 'সমতা'ও নাট্য-গ্রন্থে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে বিষম সমস্যার সৃষ্টি করে। সংস্কৃত নাটককারের পক্ষে এইটুকু বক্তব্য, (এবং এইটুকু বলিলেই তাঁহার কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় মিলিবে), যে অন্য সাহিত্যের নাট্যকার যেমন একই ভাষা বহু করিয়া একের বহুত্ব ও বহুর একত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তিনি বহু প্রাকৃতের প্রকৃতির সহিত এক সংস্কৃতের প্রকৃত প্রকৃতির তত্ত্বের মিলন সাধন করিয়া, বহুকে একের অঙ্গীভূত করিয়া, মানব প্রকৃতিতে, দেব প্রকৃতির মিলনের মতন এক অদ্ভুতপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাসামগ্রীর মধ্যে পরিমাণগত (quantity) বৈসাদৃশ্যই শুধু নাই, তাহাতে স্বরূপ (quality) গত বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান;—অথচ সে উপাদানের একীকরণে গোঁজামিল বা তৈলজলে মিলনের নমুনা লিখিত হয় না।(৩)

এইবার আমরা নাটকে প্রাকৃত-ভাষা বিষয়ক কয়েকটি প্রামাণ্য-সূত্রের উদ্ধার ও আলোচনা করিব। এইগুলি হইতেই 'নানাবস্থান্তরাত্মক' প্রাকৃত ভাষাসমূহের প্রয়োগের কৃতিত্বেও যুক্তি প্রতীয়মান হইবে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনি বলিতেছেন:—

ভাষা চতুর্ব্বিধা জ্ঞেয়া দশরূপে প্রয়োগতঃ।
সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চৈব যত্র পাঠ্যং প্রযুজ্যতে ॥
(?) অতিভাষার্য্যা (র্য ?) ভাষা চ জাতিভাষা তথৈব চ।
তথা জাত্যন্তরী চৈব ভাষানাট্যে প্রকীর্ত্তিতা ॥

(১) Shakespear এর Mid-summer Night's Dream, King John ও Hamlet দ্রষ্টব্য।

(২) রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' ও 'নব নাটক' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(৩) এস্থলে যাহা বলা হইল তাহা চরম যুগের অর্ব্বাচীন নাট্যকারের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। অশ্বঘোষ, ভাস প্রভৃতি হইতে বহুভাষাবিদ্ কবি রাজশেখর পর্য্যন্ত সকলের সম্বন্ধেই এ উক্তি করা চলে।

অতিভাষা তু দেবানামার্য্যভাষা তু ভূভুজাং।
সংস্কারপাঠ্যসংযুক্তা সম্যগ্‌গ্রামপ্রতিষ্ঠিতা।
বিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা।
ম্লেচ্ছশব্দোপচারা চ ভারতং বর্ষমাশ্রিতং॥
অথ জাতত্যন্তরী ভাষা গ্রাম্যারণ্যপশূদ্ভবা।
নানা বিহঙ্গজা চৈব নাট্যধর্ম্মী প্রয়োগজা॥

*   *   *   *

ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্য ঐশ্বর্য্যেণ প্লুতস্য চ।
দারিদ্র্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যেণ প্লুতস্য চ॥
উত্তমস্যাপি ব্রুবতঃ প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ।
ব্যাজলিঙ্গপ্রতিষ্ঠানাং শ্রমণানাং তপস্বিনাং॥
ভিক্ষু চক্রবরণানাং (?) প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ।
বালে গদোপসৃষ্টে চ স্ত্রীণাঞ্চ প্রকৃতৌ তথা।
নীচে মত্তে সলিঙ্গে চ প্রাকৃতং পাঠ্যমিষ্যতে।
পরিব্রাণ্ মুনিশাক্যেষু বাক্যেষু (?) শ্রোত্রিয়েষু চ॥
দ্বিজ যে চৈব লিঙ্গস্থাঃ সংস্কৃতং তেষু যোজয়েৎ।
রাজ্ঞশ্চ গণিকায়াশ্চ শিল্পকার্য্যাস্তথৈব চ।

*   স্থ   *   *

নৃপপত্ন্যা ভবেৎ পাঠ্যং সংস্কৃতং দ্বিজসত্তমাঃ॥
ক্রীড়ার্থং সর্ব্বলোকস্য প্রয়োগস্যসুখাশ্রয়ং॥
কলাভ্যাসাশ্রয়ং চৈব পাঠ্যং বেশ্যাসু সংস্কৃতং।
কলোপচার জ্ঞানার্থং ক্রীড়ার্থং পার্থিবস্য তু॥
নির্দ্দিষ্টং শিল্পকার্য্যাস্তু নাটকে সংস্কৃতং বচঃ।
অম্নায়সিদ্ধং সর্ব্বাসাং শুভমপ্সরসাং ভবঃ (বচঃ ?)॥
সংসর্গাদ্দেবতানাং বৈ তদ্ধি লোকোহনুবর্ত্ততে।
ছন্দস্তঃ প্রাকৃতং পাঠ্যং স্মৃতমপ্সরসাং ভুবি॥ ইত্যাদি

(নাট্যশাস্ত্র ১৭ অধ্যায়)

অন্যত্র (সরস্বতীকণ্ঠাভরণে) পাইয়া থাকি :—

ন ম্লেচ্ছিতব্যং যজ্ঞাদৌ স্ত্রীযুণা প্রাকৃতং বদেৎ।
সঙ্কীর্ণং নাভিজাতেষু না প্রবুদ্ধেষু সংস্কৃতং॥

উল্লিখিত সন্দর্ভদ্বয় হইতে নাট্যকার নাটককে কেন 'নানাদেশসমুত্থ' ভাষায় অলঙ্কৃত করেন, তাহার মূলতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্য নট-সূত্রাকারের অনুসরণে নাট্যশাস্ত্রকার এক যুক্তি-

সঙ্গত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। দেবতা, ভূদেবতা, নরদেবতা, অভিজাত, প্রাকৃত, অপ্রবুদ্ধ মানুষ—বিভিন্ন ব্যবসায়রত মানুষ, স্ত্রীলোক—ইঁহাদের কথোপকথনের প্রণালীতে মূলতঃ পার্থক্য আছেই—আর এই বিভিন্ন শ্রেণীর জীব লইয়াই নাটকের শরীর ও মন। তাহার উপর সম্প্রদায়গত দ্বেষপ্রীতি, কলাকৌশলগত ভেদ ইত্যাদি নানাকারণে সংস্কৃত নাটকের আপাত-সরল ভাষা-বিভাগ-তত্ত্বকে কিছু জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এই শ্লোকসংগ্রহ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, এরূপ ভাষা, অভিভাষা, বিভাষার পরিভাষা ও সংজ্ঞাকল্পনা একেবারে কবির যদৃচ্ছাকল্পিত নহে।

সমৃদ্ধি-শক্তির দিনে, বিদর্ভ-রাজধানীস্থ অধিবাসীর চরিত্রগত দোষ সমূহের মধ্যে অক্ষক্রীড়া সম্ভবতঃ কালক্রমে তাহাদের 'গুণরাশিনাশীদোষ' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল,—আলঙ্কারিকের কারিকায় 'দাক্ষিণাত্যা হিদীব্যতাং' এই আধার-আধেয়ের দোষ-গুণ, সঙ্কল্প-বিকল্পের অল্প আভাস দিতেছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-অঞ্চলের ব্রাহ্মণসম্প্রদায় অকর্ম্মণ্য, শাস্ত্রালোচনার অভাবে অপরিণত বুদ্ধি, 'স্বকর্ম্মজ্ঞ', বেশ-ভূষা, হাব-ভাবের দ্বারা হাস্যোৎপাদক চাটুকারে পরিণত থাকিতে পারেন,—'প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং' হয়ত সেই লুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত করিতেছে। পুরাবৃত্ত, কাব্যকলা, ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্মনিবন্ধ এইরূপ ধারণাকে প্রশ্রয় দেয় বলিয়া আমরা ইহার নির্দ্দেশ করিলাম। দীর্ঘ আলোচনা ও গবেষণার ফলে এ বিষয়ের মূল কথা উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির ইদানীন্তন পারিবারিক জীবন হইতে এ বিষয়ের এক সৌসাদৃশ্য (analogy) মিলে এবং তাহাও আমাদের কল্পিত সিদ্ধান্তের সহায়তা করে। বাঙ্গালার সমাজ-নাট্য-সাহিত্যে অতি মাত্রায় কল্পিত ভারতীয় জাতিবিশেষের সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধের কথা দূরে থাকুক, সঙ্গতিপন্ন বাঙ্গালীর ঘরে 'ঠাকুর ও মালীর সহিত উড়িয়া-ভাষার সংযোগ এবং দ্বারবান্‌-মহারাজের ভাষার সহিত পশ্চিমেভাষার সম্বন্ধটা তুলনা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে। নাট্যশাস্ত্রকারের 'জাতি-ভাষা' ও 'জাত্যন্তরী' ভাষার আলোচনা-প্রণালী, বিজ্ঞ আলঙ্কার ধনঞ্জয় ও কবিরাজ বিশ্বনাথের উক্তি 'যদ্দেশং নীচপাত্রং স্যাৎ তদ্দেশং তস্য ভাষিতং'—এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাট্য-সাহিত্যের ধারা-জ্ঞান আমাদিগকে উল্লিখিত মতের প্রতি আস্থাযুক্ত করিয়া তুলে। অন্যদিকে ইহাও স্পষ্টই স্বীকার করিতে হয় যে, কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপকসমূহের সাহায্যে এমন সামান্য নিয়মে (generalisation) উপনীত হইতে গেলে বিশেষ লাঞ্ছনা ও ভ্রমাকুলত্বের সম্ভাবনা।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপকসমূহের প্রাকৃত-ভাষার সহিত অশ্বঘোষ, কালিদাস, শূদ্রকের প্রাকৃত-ভাষার তুলনাই চলে-না। যেখানে সরলতা, সুকুমারতা, স্বাভাবিকতা, সহৃদয় হৃদয়-হারিতা ছিল, সেইখানে কৃত্রিমতা, কষ্টকল্পনা, হৃদয়হীনতা স্থানলাভ করিয়াছে;—এটি হইয়াছে কেবল কালের প্রভাবে। বিভিন্ন প্রাকৃত সাহিত্যও বহুপূর্ব্বে সাহিত্যের ও ব্যাকরণের ধরাবাঁধা আইন-কানুনের দ্বারা অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল—তবে দক্ষ সাহিত্যিকের রচনা-রীতি অসাড়, নির্জ্জীব ভাষায়ও প্রাণ-শক্তির সঞ্চার করে;—অর্ব্বাচীন কবি রাজশেখরের

প্রাকৃত-রচনা এই কথার যাথার্থ্য সংসূচিত করে। আলঙ্কারিক-বৈয়াকরণ, কোষকার পরবর্ত্তী সিদ্ধ হেমচন্দ্র প্রাকৃত-ভাষার প্রশংসাকল্পে যাহা বলিয়াছিলেন—

ণবমথ্থদংসণং সংনিবেসসিসিরাও বন্ধরিদ্ধীও।

অবিরল মিণমো (অবিরলমেবং) আভুবণ বন্ধমিহণবর পয়রমি (প্রাকৃতে)॥

তাহা তাৎকালিক এবং তাঁহার দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারগণের প্রাকৃত-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা বিভিন্ন যুগের প্রতিনিধি বিখ্যাত নাট্যকারগণের প্রাকৃত-ভাষার সন্দর্ভ এক একটি করিয়া উদ্ধৃত করিব—ইহা হইতেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে কেমন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ প্রাকৃত-ভাষা-সমূহের কোমল-সুকুমার প্রকৃতির তিরোভাব ঘটিতেছিল, কেমন করিয়া idiomatic প্রাকৃতের তিরোভাবে প্রাকৃত-সাহিত্যের উচ্ছেদের পথ প্রশস্ত হইতেছিল।

অশ্বঘোষের নাটকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রাকৃত-সম্বন্ধে অধ্যাপক লুডার্জ ও ব্রাটুক আপন আপন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাসের রচনা হইতে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাউক—

প্রতিহারী। এবং বিহস্স- সুহিজ্জণেণ পরিগিহীদস্স বচ্ছরাঅস্সঅং বুত্তন্তো।..... থোকৃথ দাণি সঙ্কটেসু বাণ বিসীদদি বিসমগদো বাণ পচ্চবচিঠ্ঠাদ, বক্কিদো বাণ নিব্বেদং গচ্ছদি, পড়িঘাদেসু বা পাণা ন সমুজ্ঝতি সোথ্থু বুদ্ধিমন্তো পুচ্ছীদি পঢ়মং এব্ব মে বচ্ছস্স বয়চাসা।

ইহার সহিত পরবর্ত্তী যুগের কালিদাসের নিম্নোদ্ধৃত প্রাকৃত-রচনা পাশাপাশি রাখিলে দেখা যায়, বিদগ্ধ কবি তাঁহার ভাষার সুন্দরভাবে সংস্কার করিয়া কেমন সরলতা, গম্ভীরতা ও সুকুমারতার শক্তি আনিয়াছেন :—

প্রিয়ং। দাব এণং লজ্জাবণদ মুহিং পরিসসজিঅ সঅং তাদকস্সবেণ এবং আহণন্দিদং দিট্ঠিআ ধুমাউলিদদিট্ঠিণো বিজমাণস্স পাবএ এব্ব আহুঈ পড়িদা। বচ্ছে সুসিস্সপরিদিণ্ণা বিজ বিজ্জা অসো আণজ্জা সংবুত্তা। অজ্জ এব্ব ইসিপরিরক্খিদং তুমং ভত্তুণো সআসং বিসজ্জেমিত্তি।

অন। অহ কেণ সূইদো তাদকস্সবস্স অঅং বুত্তন্তো।

প্রিয়ং। অগ্গি সরণং পবিট্ঠস্স সরীরং বিণা ছন্দোমই এ বাণিআব। (অভিজ্ঞানশকুন্তল—চতুর্থাঙ্ক)

ভবভূতির প্রাকৃতে কোমলতার স্থানে পরুষতা ও বিকটবন্ধত্ব প্রবেশ লাভ করিয়াছে—সেখানে কবির নিপুণতাও এ বিষয়ে কবিকে সাবধান করিতে পারে নাই। নিম্নোদ্ধৃত সরলতম, সুন্দরতম অংশে কৃত্রিমতা সমাস-বাহুল্য ও বিকট-বন্ধত্বের সন্ধান স্থানে স্থানে মিলে :—

(১) নাট্যশাস্ত্রে এই প্রসঙ্গে 'জাতি' ভাষা ও 'জাত্যন্তরী' ভাষার উচ্চারণে উল্লেখযোগ্য

(১) নাট্যশাস্ত্র ১৭।৫৮-৩২।

বিশেষত্বের নির্দ্ধারণ আছে। ইহা হইতেই প্রাকৃত-প্রয়োগ-প্রণালী (Idiom) ও ব্যাকরণের স্থিরতা অসংশয়িত ভাবে প্রমাণিত হয়। স্বয়ং নাট্যশাস্ত্রকারই 'সংস্কার-পাঠ্যসংযুক্তা' প্রাকৃত ভাষারই অবলম্বনীয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রাকৃত ব্যাকরণ, সাহিত্যের প্রাচীনতা এবং বহুল বিস্তারও এই বিষয়েরই সমর্থন করে। মূলসূত্রকার মহর্ষি বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া, শাকল্য ভরত, কোহল, বররুচি, ভামহ, বসন্তরাজ, ত্রিবিক্রম, সিংহরাজ, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের শব্দশাস্ত্রবিদ্ প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি-স্থিতি ও পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির আলোচনা করিয়াছেন। কালের গতির সহিত প্রাকৃত ভাষা-বিভাষা-উপভাষার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে :—প্রাকৃত-প্রকাশে আলোচিত ভাষাসমূহের স্বল্প সংখ্যকতার সহিত সিদ্ধ হেমচন্দ্রকৃত প্রাকৃত গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট ভাষাসমূহের বাহুল্যের তুলনা করিলে এ বিষয় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। তবে অবশ্য সকল বিভাষা-উপভাষা নাটকে সমভাবে আদরলাভ করে নাই—অনেক নাটকীয় ভাষাই ভাষা-বিভাগতত্ত্বের আলোচনায় উল্লিখিত হইয়াই নামমাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে; বস্তুতঃ অধিকাংশ নাট্যকারই দুই তিনের অধিক প্রাকৃত ভাষার(৩) প্রয়োগ করেন নাই। এক সংস্কৃতরূপ সাহিত্যের চির নবীন সৃষ্টি মৃচ্ছকটিকে বহু প্রাকৃত ভাষা ও বিভাষার ছায়া ও কায়ার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। নাট্যশাস্ত্রে শৌরসেনী প্রাকৃতকেই মূলপ্রাকৃত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে—বররুচি প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাকরণকার এবং আচার্য্যদণ্ডীও মহারাষ্ট্রীকে মূলপ্রাকৃত বা প্রকৃষ্ট প্রাকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য নাটকীয় প্রাকৃত ভাষা এই ভাষা হইতে বিভিন্ন, শব্দ-উচ্চারণ প্রভৃতির স্থূল তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সকলের বিশেষত্ব ও বিবর্ত্তের ধারাপ্রকাশ সম্ভবে না, সুতরাং এ বিষয়টির উল্লেখ করিয়াই আমাদিগকে বিষয়ান্তরের আলোচনায় নিযুক্ত হইতে হইতেছে। অধ্যাপক লেভি পিশেল, ডাঃ ষ্টেন্ কোনো(৪) প্রভৃতির সিদ্ধান্তও এই মতের প্রতিকূল নহে।

নাটকের প্রাকৃত কথিত ভাষা কিনা, এ বিষয়ে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সুধীবর্গের মতের সহিত প্রাচীন প্রাচ্য-শাস্ত্রকারের মতের প্রকৃত পক্ষে অসামঞ্জস্য নাই। উভয় পক্ষই নাটকীয়

(২) The Sans-dramas, in general, contain little but the ordinary Prakrit in its two closely united forms, the Sauraseni (the dialect used in prose) and the Maharashtri (that used in poetry). The same rules apply to both &c—Cowell's Prakrit Prokasa, Introduction.

(৩) মৃচ্ছকটিকের প্রসিদ্ধ টীকাকার পৃথ্বীধর বলেন,—নাটকাদৌ বহুপ্রকারপ্রাকৃতপ্রপঞ্চেষু চতস্র এব ভাষাঃ প্রযুজ্যন্তে—শৌরসেন্যবন্তিকাপ্রাচ্যামাগধ্যঃ। অন্যান্ত মহারাষ্ট্র্যাদয়ঃ কাব্য এব প্রযুজ্যন্তে। (অবশ্য অভিজাত স্ত্রীচরিত্রের উক্তি প্রত্যুক্তিতে মহারাষ্ট্রীগাথার কোন কোন স্থানে প্রয়োগ মিলে—বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রয়োজয়েৎ।) অপভ্রংশপ্রপঞ্চেষু চতস্র এব ভাষাঃ প্রযুজ্যন্তে—শাকারীচাণ্ডালীশাবরী-ঢক্কদেশীয়াঃ। মৃচ্ছকটিকে শবরপাত্রাভাবাৎ শাবরী নাস্তি। ঢক্কা তু বনেচরাণাং ভাষা।

(৪) Levis Theatre de India, Pischel-Grammatille der Prakrit Sprachen—
S. Kwnow in Lanman's Karpura-Manjaril. Harvard or Sener.

প্রাকৃত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; সাহিত্যের ভাষা যে কথিত ভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইবে, এ বিষয়ে তখনকার দিনে কোন প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল না। তাহার উপর যখন দেখা যায় যে, নাট্যকারগণ গতানুগতিক হইয়া প্রাচীন লুপ্তপ্রায় ভাষাকেও চালাইয়া গিয়াছেন, তখন বাদপ্রতিবাদের প্রশ্নই উঠে না। মহারাষ্ট্রী-প্রকৃতিবিশিষ্ট প্রাকৃত ভাষাসমূহেরও বহুল প্রচার সাহিত্যে ছিল, তাহাদের কতক গ্রন্থ এখনও আমরা পাইয়া থাকি। এই সকল প্রাকৃত ভাষার সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত সমভাবে কখন কখনও বা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আলোচিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উভয় সাহিত্যকে শক্তিশালী করিয়াছে, জাতীয় এবং ব্যক্তিগত জীবনের আশার আশ্বাস, সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণার উদ্বোধন করিয়াছে। সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণের ব্যাখ্যা ও কারণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কোন পাশ্চাত্য সুধী এমন মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রাকৃত নাট্যসাহিত্য (দেশী নাট্য সাহিত্য) হইতেই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে *।

যাক্ সে কথা। নীচ ও মধ্যম পাত্রগণের ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা ও বিভাষাগণের সহিত তত্তৎ প্রাকৃত ভাষার আদিভূমির কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এরূপ অনুমান একবারে বিচিত্র বা কল্পনাপ্রসূত না হইতে পারে, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যাখ্যা অনেক আপাতকঠিন বৈসাদৃশ্যকে মুছাইয়া দেলে। স্থানমাহাত্ম্য, বিশেষতঃ মহানগরীর মাহাত্ম্য, অধিবাসিগণের চরিত্রে দৃঢ়াঙ্কিত না হইয়া থাকিতে পারে না,—স্থানের উন্নতি অবনতির ধারার অপেক্ষা না করিয়া লোকসমাজে—এবং তাহা হইতে সাহিত্যে—তথাকার দোষগুণ, তাহার স্মৃতির সহিত জড়িত হইয়া যায়, এবং লোকপরম্পরায় শ্রেণীগত চরিত্রের সহিত দেশগত বা জনপদগত বিশেষত্বের কাকতালীয় ন্যায়ে সংযোগ ঘটিয়া থাকে। হিন্দুরাজত্বের মধ্য ও শেষভাগে অবন্তীনগরী এক অতুলনীয়া মহানগরীই ছিল। মহানগরীতে শোভন উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহের জন্ম এখনকার মত তখনকার দিনেও অধিকাংশ অধিবাসীকেই ধূর্ত্তজীবী (Shrewd) হইতে হইত;—নহিলে লোকের আত্মমর্য্যাদা (Prestige) এর হানি ঘটিত। কালক্রমে বিচিত্র বিধাতৃ নির্ব্বন্ধে অবন্তিপুরীর 'সহরে' ভাষার সহিত ধূর্ত্ততার এক সমবায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গেল। নাট্যসাহিত্যের অবন্তীর ভাষা ধূর্ত্তের ভাষা বলিয়া আখ্যা লাভ করিল—এইরূপ অলঙ্কারশাস্ত্রে ভাষা-তত্ত্বনিরূপণ প্রস্তাবে সূত্র হইল "ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা"। বিদর্ভ রাজ্যের বিলাসবিভব,

ভাষা-বিভাগ-তত্ত্বের স্বাভাবিকত্বের আংশিক সমর্থন প্রসঙ্গে Monier Williams তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Indian Wisdom এ বলিয়াছেন—"There is a suitableness in women speaking Prakrit. Harsh consonants are often softened off and compound

* Prof Schroder holds with Levi that the Sanskrit drama descends from a Prakit drama and that thus alone can the mixture of dialects be explained. This view is curiously paradoxical and contrary to all probability—Dr Keith J. R. A. S. 1909 (pp. 208-09)

ones simplified. "Pionor" certainly comes more suitably from female lips than "plumbum.", and সউন্দলা than শকুন্তলা ।" এই প্রসঙ্গে কোন কোন পণ্ডিত এক উল্টা অভিযোগ আনিয়া সংস্কৃত নাট্যকারের তরফটার মাটি করিতে চাহেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, এরূপ ভাষা-বিভাষার প্রয়োগ ও বিধিকল্পিত সম্মিশ্রণে কবির কৃতিত্ব জাহির হইলেও, পাত্রবর্গ বিভিন্নভাষাভাষী হওয়ায় একে অন্যের বাক্যের অর্থগ্রহ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হয় না বলিয়া কাব্যাংশের দিক্ দিয়া এ মৌলিকতায় এক অনাসৃষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের এ অভিযোগ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর—কেননা আজ পর্য্যন্তও ভারতের গৃহে, জনপদে, সর্ব্বত্রই বিভিন্ন ভাষাভাষিগণের পরস্পর কথোপকথনের দ্বারা ভাবের আদান-প্রদানের দৃষ্টান্ত সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এই সকল 'ভাষা' ও 'বিভাষা' সম্বন্ধে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে—এবং সেই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাট্যশাস্ত্র-সমালোচকগণ—(ধনঞ্জয়, বিশ্বনাথ প্রভৃতি) তাঁহাদের গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা দ্বারা বিধি ব্যবস্থার সৃজন করিয়াছেন। ভাষার নামকরণ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার (differentiation in use) লইয়া নাট্য-শাস্ত্রকার বলেন :—

মাগধ্যবন্তিজা প্রাচ্যা শৌরসেন্যর্দ্ধমাগধী ।
বাহ্লীকা দাক্ষিণাত্যা চ সপ্ত ভাষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ বিভাষাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥
শবরাভীরচাণ্ডাল সচর (?) দ্রবিড়োঢ়জাঃ ।
হীনা বনেচরাণাঞ্চ বিভাষা নাটকে স্মৃতা ॥
মাগধী তু নরেন্দ্রাণামন্তঃপুরনিবাসিনাং ।
চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী ॥
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানকপ্যবন্তিজা ।
নায়িকানাং সখীনাঞ্চ শূরসেনাবিরোধিনী ॥
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যাথ দীব্যতাং ।
বাহ্লীকভাষোদীচ্যানাং (দিব্যানাং ইতি সা দ) খসানাঞ্চ স্বদেশজা ॥
শবরাণাং শকাদীনাং তৎস্বভাবশ্চ যোগণঃ ।
সকারভাষা যোক্তব্যা চণ্ডালী পুক্কসাদিষু ॥
অঙ্গারকারব্যাধানাং কাষ্ঠযন্ত্রোপজীবিনাং ।
যোজ্যা শবরভাষা তু কিঞ্চিৎ বাণৌকসী তথা ॥
গবাশ্বাজা বিকোষ্ট্রাদিঘোষ স্থান নিবাসিনাং ।
আভীরোক্তিঃ শাবরী বা দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিষু ॥
সুরঙ্গা খনকাদীনাং শৌণ্ডিকাণাঞ্চ রক্ষিণাং ।
ব্যসনে নায়কানাং স্যাদাত্মরক্ষাসু মাগধী ॥ ইত্যাদি (নাট্যশাস্ত্র ১৭শ অধ্যায়)

এই সন্দর্ভ হইতে নাটকীয় বিভিন্ন ভাষার সহিত রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক বিভিন্ন বিভাগের কতকটা সম্বন্ধ সহজে পরিলক্ষিত হয়। একই ভাষা (প্রকৃতি) নানা নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক কারণে বিভিন্ন প্রদেশে ও জনপদে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছিল ;—এবং কালক্রমে সংস্কৃত নাটকের অভ্যুদয়ের যুগে এই বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন পাত্রের মুখ দিয়া সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়া গেল। অবশ্য ডাঃ হুইট্নী প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের মতের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, এ কথা স্বীকার্য্য।* পরবর্ত্তী যুগের গ্রন্থ সাহিত্যদর্পণ এই ভৌগলিক মূলের কতক কতক স্থানে লোপসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই এ বিষয়ে যথেষ্ট হইবে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে 'বাহ্লীকভাষোদীচ্যানাং' এই মত মিলে—বিশ্বনাথ বলেন, 'বাহ্লীকভাষা দিব্যানাং'। বস্তুতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে যদি কোন প্রাচীনতর গ্রন্থ মিলিত, তাহা হইলে নাটকীয় সাহিত্যের বিভিন্ন প্রাকৃতভাষার সহিত তাৎকালিক জনপদের ও প্রদেশসমূহের প্রকৃতির সম্বন্ধবিশেষ স্পষ্টভাবে ধরা যাইত।

সীতা। সহি বাসন্দি! কিং তুম্‌ কদং অজ্জউত্তস্‌স মম অ এদং দংসঅন্তীএ। হদ্ধী হদ্ধী সোজ্জেব অজ্জউত্তো তংজ্জেব পঞ্চবটীবণং, সাজ্জেব বাসন্দী, তেজ্জেব বিবিহ বিসম্ভ সাক্‌খিণো গোদাবরী কাণণুদ্দেসা তেজ্জেব জাদনিব্বিসেসা মঅপক্‌খিপাদবা, সা জ্জেব চাহং, মমউণ মন্দ ভাইণীএ দীসন্তংবি সব্বংজ্জেবনখিত্তি, তা ইদিসো জীঅলোকস্‌স পরিবত্তো। (উত্তররামচরিত-তৃতীয়াঙ্ক)

ভবভূতির রচনায় মধ্যে-মধ্যেই স্ত্রীচরিত্রের প্রাকৃত-ভাষা ত্যাগ করিয়া 'সংস্কৃতমাশ্রিত্য' কথোপকথন, প্রাকৃত-প্রয়োগের স্বল্প প্রসার—প্রাকৃত সাহিত্যের 'বাজার মন্দা' সংসূচিত করিয়াছে। অলঙ্কারিকগণ এই দুর্যোগের দিনে কবিদের শরণে আসিয়া বিধান দিয়াছেন—"বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতঞ্চান্তরান্তরা।" ভাষাবিদ্ স্বনামধন্য রাজশেখর কবি কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন—তাঁহার প্রাকৃত রচনারীতিতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবার যোগ্য। নিম্নে তাঁহার বিখ্যাত সট্টক কর্পূর-মঞ্জরী হইতে একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইল :—

বিদূ। আ দাসীএ ধীএ! ঈরিসোহং মুখ্‌খো জোতুএবি উঅহসিজ্জামি। অহং চেে...। অহবা হত্থকঙ্কণং কিং দপ্পণে পেক্‌খী অদি।

বিচক্খণা। এব্বং ণেদং। তরং গস্‌স সিদ্ধত্তণে কি. সাক্‌খণো পুচ্ছীঅন্তি। তা বণ্ণঅ বসং তুঅং।

বিদূ। তুমং উণ পংজর গদা সারিআব্ব কুরকুরাঅন্তী চিঠ্ঠসি! ণ কিংবিজাণেসি। ভাণিরবয়স্‌সস্‌স দেবীএ পুরদো পঠিস্‌সং। অসোণ কথরিআ কুগণামে বণেবা কিক্‌খিণীঅদি ণ সুবণ্ণং কসবট্ট অং বিণা সিনাপট্টএ কসীঅদি।

* 'The mixture of dialects represents the historical state of speech at the time when the drama come into being—Dr. Whiteny's view, referred to by Dr. Keith (J. R. A. S. 1909).

রামা। পিয় বয়স্‌স ; তাপঢ়। সুনীঅহু। (কর্পূরমঞ্জরী—১ম জবনিকান্তর ১৮ ও ১৯ শ্লোকের মধ্যে)

এই সযত্নসিদ্ধ মনোহর ভাষার নিদর্শনের সহিত নিম্নোদ্ধৃত মৃচ্ছকটিককারের অযত্নলভ্য সরলসুন্দর প্রাকৃত সন্দর্ভের তুলনা করিলেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির স্বাভাবিকতা ও পরবর্ত্তী কবির অভ্যাসপটুত্ব আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়ে।

মদ। অজ্জঅ! কিংণীণকুসুমংসহআরপাদবং মহুঅরীও উণ সেবন্তি।

বসন্ত। অদোজ্জেব তাও মহু অরীও বুচ্চন্তি।

মদ। অজ্জঅ! জইসোমনীসিদো, তাকীমদাণিং সহসান অহিসারী অদি। (মৃচ্ছকটিক দ্বিতীয়াঙ্ক)

এইরূপে নাটকীয় প্রাকৃত ভাষাসমূহের পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির মূলে অন্য এক মুখ্য কারণের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। অপিচ রাজশক্তির প্রভাবে যখন উত্তর ভারতবর্ষে শান্তি, সমৃদ্ধি বিরাজ করিতেছিল, তখনই বৃহৎসংহিতার রাষ্ট্রবিভাগের কল্পনা-সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছিল। তখনই কালিদাসের নাটকাবলীতে উজ্জ্বলে মধুরের অপূর্ব্ব মিশ্রণে রূপক-সাহিত্যের অপূর্ব্ববিকাশ হইয়াছিল। তখনই "নানাদেশসমুত্থং হি কাব্যং ভবতি নাটকে" এবিধানের সামঞ্জস্য ও প্রকৃত অর্থবোধ ঘটিয়াছিল। পরে যখন রাষ্ট্রশক্তির অবসান ও গ্লানির দিন আসিল, তখন কবির কাব্যোন্মাদনা ম্লান ও হতপ্রভ হইয়া পড়িল, নাটককারের প্রাকৃত ভাষাসমূহের বিচ্ছিন্নতা ও বিকেন্দ্রীভূততায় লক্ষণ প্রকাশ পাইল, নাটকীয় চরিত্রগণের সুধাস্যন্দিনী প্রাকৃত সূক্তি স্তব্ধ হইয়া পড়িল।

ভাষা শিক্ষার বাহন—প্রাকৃত ভাষাসমূহের ভিতর দিয়া গৌরবময় আমাদের এদেশ কত উপদেশ, কত গম্ভীর তত্ত্ব, কত রীতি-নীতি প্রচার করিয়াছে, কত রসের ধারা, কত আমোদের প্রস্রবণ, কত অন্তর-সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় প্রাকৃত ভাষার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রাকৃত সাহিত্য, প্রধানতঃ পালি সাহিত্য ও জৈন মহারাষ্ট্র সাহিত্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য খণ্ডে বহু মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, সংস্কৃত রূপক-সাহিত্যের প্রাকৃত ভাষা ও তাহার স্থিতিতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতবর্গের তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। সংস্কৃত নাটকীয় সাহিত্যের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিভাগের সূক্ষ্ম আলোচনার উপর নির্ভর করিতেছে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া স্থূল সাধারণ সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপনীত হইয়া মানবের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য। চাই কেবল তাঁহাদের প্রদর্শিত রীতিতে স্থির-ধীর-চিত্তে তথ্যের নির্দ্ধারণ, সঙ্কলন ও প্রতিষ্ঠা, আর চাই তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্রসমূহের একনিষ্ঠতার সহিত অধ্যয়ন ও আলোচনা।

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ন্যায়-দর্শনে শ্রীহট্ট।

মিথিলা ও নবদ্বীপ ন্যায়-চর্চ্চার জন্য চির প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ কেবল মিথিলাকে ন্যায়-দর্শনের জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অনেকের বিশ্বাস পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ন্যায়দর্শনের চর্চ্চা ছিল না। গঙ্গেশ উপাধ্যায়, পক্ষিল স্বামী, পক্ষধর মিশ্র, বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিত-গণের জন্মভূমি বলিয়া, মিথিলা বিশেষ গৌরবান্বিত। কিংবদন্তী—মণ্ডন মিশ্রকে বিচারে পরাজিত করিয়া শঙ্করাচার্য্য মিথিলায় বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন; সেই প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মণ্ডন মিশ্র মিথিলাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"ন্যায়দর্শন" মহর্ষি গোতম-প্রণীত। গোত্রপতি গোতমঋষির "ন্যায়সূত্রই" ইহার ভিত্তিমূল। রঘুনাথ শিরোমণি "দীধিতি" গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী, গোতমের ন্যায়-সূত্রের এমন ভাবে বিশ্লেষ করিতে পারেন নাই।

গঙ্গেশোপাধ্যায়-প্রণীত "চিন্তামণি" গ্রন্থের স্রোত ফিরাইয়া দিয়া রঘুনাথ শিরোমণি "নব্যন্যায়" প্রণয়ন করেন। পূর্ব্বকালে একমাত্র মিথিলাতেই ন্যায়দর্শনের গ্রন্থ সুরক্ষিত ছিল। মিথিলার পণ্ডিতগণ দেশান্তরাগত ছাত্রগণকে ন্যায়দর্শন শিক্ষা দিতেন, কিন্তু সমা-বর্ত্তনের বেলায় ন্যায়ের গ্রন্থ মিথিলার সীমার বাহিরে আনিতে দিতেন না। কোন্ সময় হইতে ন্যায়দর্শন মিথিলার সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং কোন্ মহা-পুরুষের সাহায্যে মিথিলার সীমার বাহিরেও ন্যায়চর্চ্চার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, সেই প্রবর্ত্তন কারী মহাপুরুষ কে, তাঁহার জন্মভূমি কোথায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

চতুর্দ্দশ শকাব্দার শেষভাগে পঞ্চখণ্ড পরগণার দীঘির-পার গ্রামে, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ঔরসে ও সীতা দেবীর গর্ভে রঘুনাথের জন্ম হয়। পঞ্চখণ্ড শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত জলঢুপ থানার অধীন ও করিমগঞ্জ সবডিবিসনের এলাকাভুক্ত। শ্রীহট্ট সহর হইতে পঞ্চখণ্ড পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে ২৩ মাইল। প্রেমভক্তির পূর্ণাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম স্থান ঢাকা, দক্ষিণ হইতে ১৩ মাইল। অতি প্রাচীন কাল হইতে শ্রীহট্ট জেলা সংস্কৃতা-লোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে ন্যায়দর্শনের প্রভূত আলোচনা ছিল।—মৈথিল বিপ্র শ্রীধর আচার্য্যের সময় হইতে পুরুষ গণনায়, ঈশান পর্য্যন্ত ২৩ পুরুষ পাওয়া যায়। ঈশানের পুত্র বিদ্যামালী, তাঁহার পুত্র হরিহর আচার্য্য, হরিহরের পুত্র রমাকান্ত, তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র, রামচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র রঘুপতি ও রঘুনাথ। এই হিসাবে রঘুনাথ শিরোমণি প্রায় ৪২০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন।

বাল্যকালেই রঘুনাথের অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। শিবনাথ সিদ্ধান্ত তাঁহার প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি একদিন রঘুনাথের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বে চমৎকৃত হইয়া

বলিয়াছিলেন, "বোধ হয় এই শিশুর দ্বারা জগতের কোন অসাধারণ কার্য্য সাধিত হইবে।" তখন রঘুনাথের বয়স ৫ বৎসর। বিশেষ কোন কারণে রঘুনাথকে লইয়া তাঁহার মাতা নবদ্বীপে চলিয়া যান। গৃহে থাকার সময়েই রঘুনাথ ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ শেষ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে যাইয়া তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায়দর্শন পড়িতে আরম্ভ করেন। রঘুনাথ, রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ, ইঁহারা সকলেই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র।

"দীধিতি"র ন্যায় ন্যায়ের এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর নাই। রঘুনাথের অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার, এ কথা অধ্যাপক মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ন্যায়ের ব্যাখ্যায় ও তর্কশক্তির উৎকর্ষে রঘুনাথ তাঁহার গুরুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। "দীধিতি" গ্রন্থের উপক্রমণিকার শ্লোকগুলি যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, তেমনি যার-পর-নাই আত্মাভিমানব্যঞ্জক। বাসুদেব সার্ব্বভৌম "সার্ব্বভৌমনিরুক্ত" নামে ন্যায়ের এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অচিন্তিতপূর্ব্ব তর্কশক্তির প্রভাবে রঘুনাথ ঐ গ্রন্থের বহু দোষ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অধ্যাপকের অনুজ্ঞা গ্রহণে তিনি শকাব্দা ১৩২১ সনে মিথিলায় ন্যায়-দর্শন শিক্ষা করিতে গমন করেন। মিথিলায় রঘুনাথ শিরোমণির শিক্ষাগুরু ছিলেন পণ্ডিতকুলচূড়ামণি পক্ষধর মিশ্র। এই সময়ে তিনি "সামান্যলক্ষণা" নামক এক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ এই গ্রন্থের নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করেন। তদুপলক্ষে পক্ষধর মিশ্রের সঙ্গে বহুদিন ব্যাপিয়া বিচারের পর, তিনি আপন শিষ্য রঘুনাথের নিকট স্বীয় মতের অসারতা স্বীকার করেন।

ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া কোনও ছাত্র ন্যায়গ্রন্থ দেশে লইয়া যাইতে পারিবে না, মিথিলার ইহাই রীতি ছিল। শিক্ষা শেষ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিবার জন্য রঘুনাথ তদীয় গুরুর নিকট বিদায়প্রার্থী হইলে, গুরুদেব তাঁহার নিকট হইতে ন্যায়ের গ্রন্থপত্র কাড়িয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথ অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে সমগ্র ন্যায়গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে গ্রন্থপত্র লইয়া যাওয়ার সময় তিনি গুরুকে বলিয়াছিলেন, গ্রন্থপত্রের প্রত্যর্পণে আমার আপত্তি নাই, ক্ষতিও নাই, সমগ্র ন্যায়গ্রন্থ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে। অতঃপর নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রঘুনাথ ন্যায়গ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ঋষি প্রণীত "ন্যায়গ্রন্থ" প্রাচীন ন্যায় এবং শিরোমণি বিরচিত ন্যায়গ্রন্থ "নব্যন্যায়" নামে পরিচিত হইয়াছে।

অতিপ্রাচীন কাল হইতে ভারতের যে সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, ন্যায়শাস্ত্রের মীমাংসা দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, এবং এতকাল যাঁহাদের মত অভ্রান্ত বলিয়া পণ্ডিতসমাজ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, শ্রীভূমি শ্রীহট্টের অঙ্করত্ন ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের শিরোভূষণ রঘুনাথের অসাধারণ তর্কবলে সে সকল সিদ্ধান্ত বহু স্থলে, অপসিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছিল। নৈয়ায়িক সমাজে "শিরোমণি" শব্দ যোগরূঢ় রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রঘুনাথের সময়ে নবদ্বীপ সাধারণো সারদাপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-

ছিল। রঘুনাথ নবদ্বীপেই শাস্ত্রতত্ত্ব আলোচনায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথের সময় হইতে মিথিলার সীমার বাহিরে ন্যায়ের উপাধি প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

"দীধিতি" গ্রন্থে ন্যায়দর্শনের তত্ত্ব সকল এত নিগূঢ় ও পরিষ্কৃতরূপে বিবেচিত হইয়াছে যে, ইহা একখানি নূতন ন্যায়গ্রন্থ রূপে পরিগৃহীত হইয়া "নব্যন্যায়" নামে অভিহিত হইয়াছে। তিনি "পদার্থখণ্ডন" নামে আর একখানি গ্রন্থ এবং "আত্মতত্ত্ববিবেক" বা বৌদ্ধাধিকারের এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। শিরোমণি কৃত "নানার্থবাদ", "প্রামাণ্যবাদ", "ক্ষণভঙ্গুরবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থ দর্শন-দেহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। যতদিন সংসারে তর্ক-শাস্ত্রের আলোচনা থাকিবে, যতদিন লোকে অনুধ্যান ও ধীশক্তির সমাদর করিবে, ততদিন শিরোমণির নাম দর্শনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ফলতঃ রঘুনাথ "দীধিতি" গ্রন্থে যে প্রকার পক্ষ করিয়া গিয়াছেন, কার্য্যেও তাঁহার তদ্রূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রঘুনাথ অকৃতদার ছিলেন। বিবাহের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "পুত্র কন্যার জন্য বিবাহের প্রয়োজন; 'ব্যুৎপত্তিবাদ' আমার পুত্র ও 'লীলাবতী' আমার কন্যা। অতএব আমার বিবাহের প্রয়োজন?" শিরোমণিকৃত স্মৃতিশাস্ত্রীয় "মলিম্লুচবিবেক' নামক গ্রন্থ অদ্যাপি পণ্ডিত সমাজে আদৃত।

ন্যায়দর্শনের পূর্ব্বাপর সমস্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ন্যায়-দর্শনের প্রথম উৎপত্তি স্থান মিথিলা ও দ্বিতীয় স্থান শ্রীহট্ট। সুতরাং মিথিলার পরে শ্রীহট্ট ব্যতীত ন্যায়দর্শনের জন্মভূমি বলিয়া গৌরব করিবার স্থান আর ভারতে নাই, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীহট্টে ন্যায়দর্শনের প্রভূত আলোচনা ছিল। এদেশের বহু পণ্ডিত নবদ্বীপে টোল সংস্থাপন করিয়া শাস্ত্রতত্ত্ব আলোচনায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। মিথিলা ও নবদ্বীপ ব্যতীত ন্যায়দর্শনের আলোচনায় শ্রীহট্ট অধিক গৌরবান্বিত ছিল, একথা বলা যাইতে পারে। দর্শন-রাজ্যের সম্রাট্ শিরোমণির জন্মস্থান শ্রীহট্ট। এ কারণ শ্রীহট্টকে দার্শনিক পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের গুরুস্থান বলিলে কিছু দোষ হয় না। পূর্ব্বকালে এদেশের পণ্ডিত-গণের নবদ্বীপ একমাত্র শিক্ষাস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং তৎপ্রযুক্ত শাস্ত্রালোচন ব্যাপারে নবদ্বীপের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম দেশীয় সংবাদপত্র "সংবাদ-ভাস্করে"র সুযোগ্য সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্করত্নের জন্মস্থান শ্রীহট্ট। ইনি নবদ্বীপে অধ্যয়ন সমাপনের পর কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাড়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া ১৮২১ খৃষ্টাব্দে "সংবাদ-ভাস্কর" পত্রিকার সম্পাদকের কাজ গ্রহণ করেন। বঙ্গের প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন সতীদাহ-নিবারণের চেষ্টা। এই উপলক্ষে কলিকাতা সহরে যে বিরাট সভা আহূত হয়, তাহার প্রধান বক্তা ছিলেন—গৌরীশঙ্কর তর্করত্ন। "অষ্টাবিংশতি প্রদীপ" রচয়িতা ও "কাব্য-প্রকাশে"র টীকাকার মহেশ্বরের মত স্মার্ত্ত, আলঙ্কারিক ও দার্শনিক এই শ্রীহট্টভূমির কৃতী সন্তান। শ্রীহট্টের পণ্ডিতের কবিতাই বারাণসীধামে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর (১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত ভবানীশ্বর-মন্দিরের "স্মৃতি ফলক" রূপে অঙ্কিত থাকিয়া কাব্যশাস্ত্রে তাঁহার

অসাধারণ পাণ্ডিত্য ঘোষণা করিতেছে। ন্যায়গ্রন্থ "হেত্বাভাসে"র টীকাকার ও কুচবিহারের রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের সভাপণ্ডিত বা মন্ত্রী হরিকান্ত ন্যায়বাগীশ, এই শ্রীহট্টের আদরের ধন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টের পণ্ডিত বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব বঙ্গের রাজা শ্যামল বর্ম্মার সভা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শকাব্দা ১০০১ সনে সংস্কৃত ভাষায় "শ্যামলবর্ম্মাচরিতম্,' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে অমূল্যরত্ন রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীহট্টের ভূমিতেই গদাধরের মত নৈয়ায়িক, বাণীনাথ বিদ্যাসাগর ও রতিকান্ত সিদ্ধান্তের মত বৈয়াকরণ, "সময়প্রদীপ"-রচয়িতা হরিহরের মত জ্যোতির্ব্বিদ্, "ষট্‌চক্রে"র টীকাকার কালীচরণ সিদ্ধান্তের মত তত্ত্বদর্শীর, এবং স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণির অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশের ও জয়ন্তীপতির সভাপণ্ডিত জগন্নাথ ন্যায়বাগীশের উৎপত্তি।

শ্রীহরকিঙ্কর দাস।

ভারতে দ্যূতক্রীড়া।

অধুনা পাশ্চাত্য দেশ-প্রচলিত বিবিধ প্রকার দ্যূতক্রীড়ার সংবাদ আমাদের শ্রুতিগোচর হইতেছে। ঐ পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুসরণে ভারতে দ্যূত-প্রবর্ত্তন হইয়াছে, এরূপ ধারণা কেহ কেহ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে পুরাকাল হইতেই ভারতে দ্যূতক্রীড়ার প্রচলন হইয়াছে। পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্মরণাতীত সময় হইতে ভারতে দ্যূত প্রচলিত রহিয়াছে।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১২৪ সূক্তে লিখিত আছে।——পতিভর্তৃক নারী দ্যূতক্রীড়া দ্বারা ধনলাভ করিতেন, ইহা স্থানে স্থানে প্রচলিত ছিল।*

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয়-রচিত তিথিতে লিখিত আছে—কার্ত্তিকের শুক্ল প্রতিপদে শঙ্কর মনোহর দ্যূতক্রীড়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতএব ইহাতে দ্যূতক্রীড়া করিবে, তাহাতে সম্বৎসরের শুভাশুভ নির্ণীত হইবে। এই তিথির দ্যূত-প্রতিপদ একটী নাম।

লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় অক্ষক্রীড়ার বিধান আছে, ইহারও দ্যূত-পূর্ণিমা আখ্যা আছে।†

মহাভারতে দ্যূতক্রীড়ার প্রবল প্রতাপ লক্ষিত হয়। সভাপর্ব্ব পাঠে অবগত হওয়া যায় যে,

---

* অভ্রাতেব পুংসএতি প্রতীচী গর্ত্তারুগিব সনয়ে ধনানাং।
জায়েব পত্য উশতী সুবাসা উষা হস্রেব নি রিণীতে অপ্সঃ।

† শঙ্করস্তু পুরাদ্যূতং সসর্জ্জ সুমনোহরং। কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষেতু প্রথমেঽহ্নি ভূপতে।
তস্মাদ্দ্যূতং প্রকর্ত্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ। তস্মিন্ দ্যূতে জয়ো যস্য তস্য সম্বৎসরং শুভং, পরাজয়ে বিরুদ্ধন্তু লব্ধ নাশকরো ভবেৎ।
আশ্বিনে পৌর্ণমাস্যান্তু চরেজ্জাগরণং নিশি। দ্যূতঞ্চ নিশি সংহৃষ্টো অক্ষৈর্জাগরণঞ্চরেৎ।

যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ব্যথিত হৃদয় দুর্য্যোধন যখন শকুনির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কিরূপে যুধিষ্ঠিরকে নিগৃহীত করিতে পারি" তখন শকুনি দ্যূতক্রীড়া করিবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "দ্যূতে আমি অদ্বিতীয়, আমি অবশ্যই যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিব। যুধিষ্ঠির অনভিজ্ঞ, পণ আমার ধনু, অক্ষ শর, অক্ষহৃদয় জ্যা, হৃদয়স্ফূর্ত্তি আমার রথ।" তাহার পরে সেই দ্যূতক্রীড়ার সমাপ্তি হইলে রাজন্যবৃন্দ-পরিবৃত সভায় প্রকাশ্য দিবালোকে অসূর্য্যম্পশ্যা রাজবধূ দ্রৌপদী আনীতা ও অবমানিতা হইয়াছিলেন। এই দ্যূত-ক্রীড়াই সেই মহাযুদ্ধের প্রধান কারণ, বহুলোকক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধ নিগমের আদিভূত প্রণব, এই আখ্যা প্রদান করিলেও অত্যুক্তি দোষ হয় না।*

বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাত-চর্য্যার জন্য যখন যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন নিজকে "অক্ষদক্ষ" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। কিরূপ গুটিকা সকল কার্য্যকর হইয়া থাকে, তাহার পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন যে, বৈদূর্য্য-কাঞ্চন-দণ্ডনির্ম্মিত কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণের গুটিকা সকল তৈয়ার করিব। এজন্য লোকে বহুব্যয় করিয়া গুটি প্রস্তুত করিত।

অধিক আনন্দিত হইলেও দ্যূতক্রীড়া হইত, যথা—উত্তর কুরুগণের সহিত যুদ্ধজয় করিয়া আসিলে সমস্ত বিত্ত দ্বারা দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য বিরাট প্রস্তুত হইয়াছিলেন।†

অসাধারণ গুণসম্পন্ন নিষধপতি নলও পুষ্করের সহিত দ্যূতে সর্ব্বস্ব হারাইলে পুষ্কর দময়ন্তী পণ রাখিবার জন্যও বলিয়াছিল। ইহাতে বোধ হয় কদাচিৎ পত্নী পর্য্যন্তও পণ রাখিবার প্রবৃত্তি হইত। দ্যূতের নেশা এমনই ভয়ঙ্কর।‡

মৃচ্ছকটিক নাটকে দ্যূতের ভাষা ও দ্যূতক্রীড়ার বিবরণ বিশেষভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। যথা;—দ্যূতপরায়ণ দর্দ্দুরক বলিয়াছেন, দ্যূতক্রীড়া স্বরূপ মানবের অসিংহাসন রাজ্য কোন-স্থানেই পরাভূত হয় না, নিত্যই অর্থদান ও গ্রহণ হইতেছে। ধনলোভী ব্যক্তিগণ রাজার ন্যায়

---

* যাস্য মেতাং শ্রিয়ং দৃষ্টা পাণ্ডুপুত্রে যুধিষ্ঠিরে।
তপ্যসে তাং হরিষ্যামি দ্যূতেনাহ্বয়তাং বধ।
আহূয়তাং পরং রাজন্ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অত্র সংশয়মহমযুদ্ধবাচ চমূমুখে।
অক্ষান্ ক্ষিপন্নক্ষতঃ সন বিদ্বান বিদুষেজয়েৎ।
অক্ষাণাং হৃদয়ং মে জ্যাং রথং বিদ্ধিমমাস্তুকঃ।

† বৈদূর্য্যান কাঞ্চনান্ দান্তান্ ফলৈর্জ্যোতীরসৈঃ সহ।
কৃষ্ণাক্ষান্ লোহিতাক্ষাংশ্চ নিবৎস্যামি মনোরমান্।
ত্রিরোপাবো হিরণ্যং যচ্চান্য বহুকিঞ্চন।
যে কিঞ্চিদ্বা বক্ষ্য মত্তরেনোপি দেবিতুং।

‡ দ্যূতে প্রবর্ত্ততাং ভূয়ঃ প্রতি প্রাণোতি বান্ধব।
শিষ্টাতে দময়ন্তোকা সর্ব্বমন্যজ্জিতং ময়া।
দময়ন্ত্যাঃ পণ সাধু বর্ত্ততাং যদিমন্যসে।

দ্যূতকরকে উপাসনা করেন। তীয়া (তিন সাত এগার) দান পতনে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। দুয়া (দুই ছয় দশ) পতনে শরীর-শোষণ হইয়াছে। বাট (চারি আট বার) পতনে মারা গিয়াছি। নান্দী (এক পাঁচ বার) দান পড়ায় পণ দিতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিতেছি। আর একস্থানে দেখা যায় যে, পরাজিত পণদানভয়ে লুক্কায়িত দ্যূত-লুব্ধ সংবাহকের মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন যে, ঢক্কাশব্দে যেমন রাজ্যহীন রাজার হৃদয় হরণ করে, তদ্রূপ কত্তা (কাসু) শব্দে নির্ধনের হৃদয় হরণ করে। সুমেরু-শিখর-পতন-সম দ্যূতক্রীড়া আর করিতে পারিব না জানিলেও কোকিল-মধুর কত্তা শব্দে মনোহরণ করে।*

পরে এই সংবাহক পণদানে অসমর্থ হইলে নিতান্ত অপমানিত হওয়াতে সংসারের সকল ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিল। হায়রে দ্যূতক্রীড়ার পরিণাম!

যাজ্ঞবল্ক্যের নিয়মে জানা যায় যে,—ধূর্ত্ত কিতব প্রতি বারে শত পণের কম রাখে না। সভিক অর্থাৎ দ্যূত-সভাধ্যক্ষ তাহার জয়লব্ধ দ্রব্যের প্রতি শতে বিংশতি ভাগের একভাগ দ্রব্য গ্রহণ করিবে। অক্ষধূর্ত্ত অক্ষকিতবের জয়লব্ধ দ্রব্যের প্রতি শতে বিংশতি ভাগের এক ভাগ দ্রব্য গ্রহণ করিবে। রাজা সেই দ্যূত-সভাধ্যক্ষ কিতবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবেন। সভিকও রাজাকে অঙ্গীকৃত অংশ দান করিবেন। দ্যূতকরদিগের জয়লব্ধ বস্তু জিতের নিকট হইতে আদায় করিবেন। যেখানে রাজা নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন, সেই সভিকযুক্ত প্রসিদ্ধ ধূর্ত্ত সমাজে রাজা পরাজিত দ্রব্য জেতাকে দেওয়াইবেন। †

রাজা কতকগুলি ভৃত্যকেই দ্যূতক্রীড়ার জয়-পরাজয়নির্ণেতা সভ্যরূপে এবং কতকগুলি ভৃত্যকে সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করিবেন। যাহারা কাপট্য অবলম্বনে কিংবা বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রৌষধির সাহায্যে দ্যূতক্রীড়া করে, তাহাদিগকে শ্বাপাদি চিহ্নিত করিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। রাজা এক ব্যক্তিকে দ্যূত-সভাধ্যক্ষ করিবেন। সমাহ্বয় নামক প্রাণিদ্যূতেও এই বিধি উক্ত আছে।

---

* দ্যূতংহি নাম পুরুষস্যাসিংহাসনং রাজ্যং কৃতং
নগণয়তি পরাভবং কুতাশ্চিৎ হয়তি দদাতি নিত্যমর্থজাতং
নৃপতিরিব নিকাম মায়দর্শী সমুপস্থতে বিভাবতাজ নেন।
ত্রেতাহৃতসর্ব্বস্বঃ পাবর পতনাচ্চ শোষিতঃ শরীরঃ।
নর্দ্দিত দর্শিতঃ মার্গঃ কাটনাথামপাতিতোয়ামি ॥
অলে! কত্তাশব্দে হনইহড়কং মনুষ্মস্স। ঢক্কাশব্দে ব্ব নড়াধিবস্স পব্বত্তট্ট লব্ভস্স ॥
জানামি ন কীলিস্সং সুমেহ সিহর সম্নিভ বুদং তহবিহ কোইল মুহলে কত্তাশব্দে মনং হলদি ॥

† গৃহে সভিক বৃহস্ত সভিকং পঞ্চকং শতং। গৃহ্নীয়াদ্ ধূর্ত্ত কিতবাদিতরাদ্দশকং শতং।
স সম্যক্ পালিতোদদ্যাৎ রাজ্ঞেভাগং যথাকৃতং। জিতমুদগ্রাহয়েজ্জেত্রেদদ্যাৎ সত্যবচঃক্ষমী ॥
প্রাপ্তেতু নৃপতিমাভাগে প্রসিদ্ধধূর্ত্তমণ্ডলে। জিতংস সভিকস্থানে দপয়েন্তুস্তথাদিতু।
দ্রষ্টারো ব্যবহারাণাং সাক্ষিণশ্চত এবহি। রাজা সচিহ্নংনির্ব্বাস্যঃ কূটাক্ষোপাধি দেবিনঃ
দ্যূতমেবায়ুখ্যং কার্য্যং তস্করজ্ঞান কারণাৎ। এষ এবচিঠি জ্ঞেয়ংপ্রাণিদ্যূতে সমাহ্বয়ে

মনু বলেন যে, রাজা মনোযোগ সহকারে রাজ্য হইতে দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করিবেন। দ্যূত এবং সমাহ্বয় এই দুইটী দোষ রাজাদিগের রাজ্যের হানিকর। ইহা প্রকাশ্য চৌর্য্য, অতএব প্রতিবিধান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। *

অক্ষ-শলাকাদি অপ্রাণি দ্রব্য দ্বারা ক্রীড়াকে দ্যূতক্রীড়া বলে। মেষ-কুক্কুটাদি প্রাণি দ্বারা ক্রীড়ার নাম সমাহ্বয়। যে ব্যক্তি দ্যূত বা সমাহ্বয় নিজে করে বা অন্য দ্বারা করায়, রাজা উহাদের সকলেরই বৃস্তচ্ছেদাদি প্রাণিবধ পর্য্যন্ত সকল দণ্ড করিতে পারিবেন। দ্যূত ও সমাহ্বয় কর্ত্তা নট প্রভৃতিকে পুরে বাস করিতে দিতে নাই। এই সকল প্রচ্ছন্ন তস্করেরা রাজ্যে বসতি করিলে নানা প্রকার বঞ্চনাদি দ্বারা ভদ্র প্রজাদিগের নানারূপ পীড়া জন্মায়। দ্যূত মহা অনর্থের মূল। এইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ পরিহাসচ্ছলেও দ্যূতবশ হইবেন না।

বিষ্ণু-সূত্রের মতে কূটাক্ষ দেবীর (যাহাদের পাশায় ইচ্ছানুরূপ দান পড়ে) করচ্ছেদ দণ্ড। মন্ত্রৌষধির সাহায্য-গৃহীতা অক্ষদেবীর অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ দণ্ড। † নারদের মতেও দ্যূত সমাহ্বয়ের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ‡

সংস্কৃত সাহিত্যের স্যমন্তক-মণিস্বরূপ গদ্যকাব্য কাদম্বরীর নায়ক চন্দ্রাপীড়ের দ্যূতাভ্যাস-কথা লিখিত আছে, এবং দশকুমার-চরিতে সমাহ্বয় নামক ক্রীড়ার উল্লেখ দেখা যায়।

দ্যূতক্রীড়া নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ, তথাপি ইহার প্রচলন থাকার কারণ কি? এবং শাস্ত্রতঃ দ্যূতক্রীড়ার বিধান থাকারই বা অর্থ কি? যুধিষ্ঠির, নল প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণও কেন ঈদৃশ কুকার্য্যে রত হইয়াছিলেন? এই সকলের কারণ সম্প্রতি অনুসন্ধান করা যাউক। কোজাগরী পূর্ণিমায় দ্যূত অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হয় নাই। দ্যূত-প্রতিপদেও দ্যূতক্রীড়া না করিলে কোন পাপশ্রুতি নাই। অতএব না করিলেও দোষ হয় না। তবে যাহারা দ্যূতাভিলাষ সংযমনে অশক্ত, তাহারা এই দুই দিনও সাবধান হইয়া দ্যূতক্রীড়া করিতে পারেন।

বুঝি বা অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী-সেনা-সম্মিলিত সমরাঙ্গনে, অপূর্ব্ব রণ-কৌশলে, বহু লোকক্ষয় কর মহামারীর বীজাঙ্কুর ন্যায়, অথবা ধূমকেতুর উদয়ের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের এই দ্যূতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল।

দময়ন্তী স্বয়ম্বরে ব্যর্থ-মনোরথ কলির প্রভাবে নল দ্যূতাসক্ত হইয়াছিলেন। আর বেদের

* দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবর্ত্তয়েৎ। রাজান্তঃকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাং
প্রকাশমেতত্ তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ। তয়োর্নিত্যং প্রতিঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ।
অপ্রাণিভির্যৎক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে। প্রাণিভিঃক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ
দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃকুর্য্যাৎকারয়েৎ বা। তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা সর্ব্বাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ
দ্যূতমেতত্ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ। তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্ ৯।২২১—২২

† দ্যূতে কূটাক্ষদেবিণাং করচ্ছেদ ১৩৩।৫
উপাধি দেবিণাং সন্দংশচ্ছেদ ১৩৪।৫

‡ অক্ষবধ্র শলাকাদ্যৈ র্দেবনং জিহ্মকারিতং। পণক্রীড়া বয়োভিশ্চ পদং দ্যূতং সমাহ্বয়ং।

দ্যুতক্রীড়ার কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহার অবাধ প্রচলন ছিল না, জীবিকার জন্য বিধবা কদাচিৎ এই পথে যাইত।

রাজন্যবর্গের দ্যূতাভ্যাসে কদাচিৎ স্বার্থসাধনের সুযোগ সংঘটিত হইত, তাহার প্রমাণ দশকুমারচরিতের অপহারবর্ম্মচরিতে দেখা যায়। মনু দ্যূতসম্বন্ধে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কঠোর ভাবে নিষেধ না থাকিলে সে কার্য্যের প্রচলন থাকিতে বাধা হয় না। চৌর্য্য প্রভৃতি নিন্দিত কর্ম্ম চিরদিনই সকল সমাজে সর্ব্বশাস্ত্রমতে দূষণীয়, তথাপি ইহার প্রচলন সর্ব্বদেশেই বিদ্যমান আছে। এই প্রকার দ্যূত নিষিদ্ধ হইলেও তাহার বিলোপ-সাধন হইতে পারে নাই। আমরা উপসংহারে বলিতে চাহি যে, পণপূর্ব্বক ক্রীড়াই দ্যূত-ক্রীড়া; তাহারই নিন্দাশ্রুতি আছে, এবং তাহাতেই লোকের ধন মান নষ্ট হইয়া থাকে। সময়-যাপনের জন্য ক্ষণিক কর্ম্মক্লান্ত শরীরের একটু বিশ্রামলাভের জন্য কোন পণ না রাখিয়া পাশা-দাবা খেলা তেমন দোষের হয় না, যেহেতু ইহাতে সর্ব্বনাশ সাধিত হয় না।

চতুরঙ্গ ক্রীড়ার নিয়মও মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকলের আলোচনা দ্বারা আমরা প্রতিপন্ন করিতে চাহি যে, দ্যূতক্রীড়া বহুকাল যাবৎ ভারতে প্রচলিত আছে; অন্যের অনুকরণ করিয়া প্রচলিত হয় নাই। দ্যূতক্রীড়ার ভাল-মন্দের শেষ মীমাংসা আমরা করিব না। তাহার ভার সহৃদয় সভ্যমণ্ডলীর হস্তেই অর্পণ করিতেছি। আমরা মাত্র প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। সহৃদয় শ্রোতৃমহোদয়গণের অমূল্য সময়ের ব্যয় ও ধৈর্য্যচ্যুতি ভয়ে সংক্ষেপেই সকল কথা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে আমাদের বুদ্ধি-দৌর্ব্বল্যবশতঃ যে সকল ত্রুটি রহিয়াছে, তাহা স্বগুণে মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই সাঞ্জলি প্রার্থনা।

শ্রীদুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ।

বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ।

(METAPHYSICAL AND EMPERICAL ORDERS IN THE VEDANTA).

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য, বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, প্রথম পাদের ১৪ সূত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া বলিতেছেন—

"অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্য্য প্রপঞ্চং পরিণাম প্রক্রিয়াঞ্চ আশ্রয়তি"। কিন্তু—"পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ।"

আমরা বেদান্তদর্শনে "পরিণাম প্রক্রিয়া" এবং "বিবর্ত্ত প্রক্রিয়া"—এই দুই প্রকার কথাই দেখিতে পাই। এই যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে শব্দস্পর্শরূপরসাত্মক, সুখদুঃখ-সমাকুল জগৎটা প্রসারিত রহিয়াছে, এই জগৎ দেশ-কাল ও কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে দৃঢ় আবদ্ধ। "ইদং

জগৎ দেশতঃ কালতঃ নাম্না রূপেণ চ সর্ব্বৈঃপ্রাণিভিঃ সর্ব্বাবস্থৈ রনুভূয়তে" (তৈ° ভা°)। এ জগতের প্রতি বস্তুই খণ্ড খণ্ড ও অসংখ্য ভেদ বিশিষ্ট। এমন বস্তু জগতে নাই, যাহা প্রতিক্ষণ পরিণত না হইতেছে। সকল বস্তুই বিকারী। এই বিকারী জগৎকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই। এই বিকারী জগতের সহিতই প্রাণিবর্গের সম্পর্ক এবং এই জগতেই আমরা ও ইতরপ্রাণিবর্গ সর্ব্ববিধ ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছি। শঙ্করাচার্য্য কোথাও এই ব্যবহারিক জগৎকে অস্বীকার করেন নাই। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহাকে লইয়া আমরা সংসারের সকল ব্যবহার নিষ্পাদন করিতেছি, তাহাকে লোকে অপলাপ করিবে কি প্রকারে? যে এই জগৎকে অপলাপ করিতে চায়, সে উন্মত্ত। শঙ্করাচার্য্যে আমরা কোথাও এরূপ উন্মাদের লক্ষণ দেখিতে পাই না। তিনি এক স্থলে অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"তত্র যদি বিদ্যমানোঽয়ং প্রপঞ্চঃ দেহাদিলক্ষণঃ আধ্যাত্মিকঃ, বাহ্যশ্চ পৃথিব্যাদিলক্ষণঃ প্রবিলাপয়িতব্য ইত্যুচ্যেত, স পুরুষমাত্রেণ অশক্যঃ প্রবিলাপয়িতং" (বে° সূ° ৩।২।২১)।—

জীবদেহাদি আধ্যাত্মিক পদার্থগুলি এবং পৃথিবী প্রভৃতি 'বাহ্য' পদার্থগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। এগুলিকে বিলীন করিয়া দেওয়া, এগুলির অপলাপ করা,—কাহারই সাধ্য নাই। এগুলির অপলাপ অসম্ভব।

তিনি আর এক প্রকারেও একথা বলিয়া দিয়াছেন। জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাঁহার চক্ষে এ জগৎ অন্য প্রকারে প্রতিভাত হইবে মাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া এ জগৎ উড়িয়া যাইবে না, নষ্ট হইবে না।

শঙ্কর অনেক স্থলে এই জগতের, এই বিকারী ব্যবহারিক জগতের—আপেক্ষিক 'সত্যতা' স্বীকার করিয়াছেন। "মৃগতৃষ্ণিকাদ্যনৃতাপেক্ষয়া উদকাদি সত্যং।" মৃগতৃষ্ণিকা, গন্ধর্ব্ব-নগরাদি বস্তু—অলীক কল্পনার বস্তু; কিন্তু জলাদি বস্তু সে প্রকার অলীক নহে।

মন্দান্ধকারে একটী লোক একটা রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিল। সে, সর্পবোধে, ভয়ে সেস্থান হইতে পলায়নোদ্যত হইল। নিকটে অপর একটী লোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি উহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া উহাকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিলেন; দেখাইয়া দিলেন যে, উহা সর্প নহে, রজ্জু মাত্র। এ স্থলে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই উভয় প্রকার দৃষ্টির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ভ্রমান্ধ-দৃষ্টির পক্ষে এই সর্পবোধ স্বাভাবিক এবং এ বোধটী সত্য, মিথ্যা নহে। আবার যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার বোধও সত্য। দুই প্রকার বিভিন্ন দৃষ্টি হইতে, দুই প্রকারের বোধ উপস্থিত হইয়াছে। এই উভয় বোধে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। একে অপরের কোন ক্ষতি বা হানি করিতে পারে না।

বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে আমরা আর এক প্রকারে এই তত্ত্বই উল্লিখিত দেখিতে পাই। সে স্থলে শঙ্কর কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের একটী বিচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে সকল লোকের চিত্তে অদ্বয় আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব জাগিয়া উঠে নাই, যাহারা সংসারাবদ্ধ-চিত্ত, তাহাদের পক্ষে বিধি-নিষেধাত্মক কর্ম্মকাণ্ড কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী, যাঁহাদের অখণ্ডবোধ ও অভেদ-

বুদ্ধি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ জ্ঞানকাণ্ডই অবলম্বনীয়। শঙ্করাচার্য্য এস্থলে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, উভয়ের ভূমি হইতে উভয় কার্য্যই সত্য ও উপযোগী। উভয় কাণ্ডের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। স্থলটী এই—"স্বাভাবিক্যা অবিদ্যয়া যুক্তায়······কর্ম্ম উপদিশত্যগ্রে ; পশ্চাৎ ক্রিয়াকারকাদিদোষদর্শনবতে······আত্মৈকত্ব দর্শনাত্মিকাং ব্রহ্মবিদ্যাং উপদিশতি।·········ন বিরোধগন্ধোপ্যস্তি।"

এই সকল বলিয়া দিয়া শঙ্কর মীমাংসা করিতেছেন যে, পরামার্থদৃষ্টি জন্মিলে জগতে একত্ব-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগতের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকিবে। উভয়ের দৃষ্টিতে কোনই বিরোধ নাই।—

"পরমার্থদৃষ্ট্যা······বস্ত্বন্তরে নামরূপে তত্বতো ন স্তঃ;··· একমেবাদ্বিতীয়ং······পরমার্থ-দর্শনগোচরত্বং প্রতিপদ্যতে। যদাতু অবিদ্যয়া স্বাভাবিক্যা······তদা সর্ব্বোয়ং বস্ত্বন্তরাস্তিত্ব ব্যবহারোঽস্তি।······অতো ন কাচন বিরোধাশঙ্কা"

দ্বৈত-সত্ত্বেও অদ্বৈত-বোধ জন্মিতে পারে। একত্ববোধ জন্মিলেই যে এই বহুত্বপূর্ণ জগৎটা শূন্য হইয়া উড়িয়া যাইবে, তাহা নহে। শঙ্কর পুনঃপুনঃ সর্ব্বত্র এ কথা বলিয়া দিয়াছেন। এইজন্যই শঙ্কর "পরিণামবাদকে" রাখিয়াই "বিবর্ত্তবাদ" গ্রহণ করিতে পারিয়া-ছেন। অনেকে এই তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। না বুঝিয়াই তাঁহারা শঙ্করকে উপহাস করেন।

এই জগৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে দৃঢ় আবদ্ধ। এই জন্য যে দিকেই দেখ, সেই দিকেই কেবল বিকার, কেবল পরিবর্ত্তন, কেবল পরিণাম আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কিন্তু এই পরিণামের অন্তরালে একটী অপরিণামী সত্তা রহিয়াছে। সে সত্তা সকল বিকারের অতীত। কেন না, উহা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার বাহিরে। পরমার্থদর্শীরা এই নির্ব্বিকার সত্তার অনুভব করেন।

শঙ্করাচার্য্য যে বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ—উভয় প্রকার বাদই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্য প্রকারেও প্রমাণ করিতে পারি। কি প্রকারে এক নির্ব্বিকার সত্তা হইতে এই বহুবিকারময় জগৎ অভিব্যক্ত হইল,—ছান্দোগ্যভাষ্যে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য, অত্যন্ত সাবধানতার সহিত, একটী পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর একটী বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। এই দুই প্রকার দৃষ্টান্ত একত্রে গ্রহণ করাতেও তাঁহার উদ্দেশ্য স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। লোকে এই সকল গূঢ় উদ্দেশ্য ভাষ্যে মনোযোগ দিয়া দেখে না। দেখে না বলিয়াই, শঙ্করের প্রকৃত মত বুঝিতে না পারিয়া গোলযোগ করিয়া ফেলে। আমরা এ স্থলে শঙ্করের উক্তিগুলি প্রদর্শন করিতেছি।—"যাহা নির্ব্বিকার সদ্বস্তু, তাহাই এখন ইদং-শব্দ ও ইদং-বুদ্ধির বিষয়রূপে অবস্থান করিতেছে। এই জগৎ সদ্বস্তুরই সংস্থান-ভেদমাত্র। আমাদের বুদ্ধি সদ্বস্তুরই অবয়বের কল্পনা করিয়া লয় এবং বুদ্ধি-কল্পিত অবয়ব হইতেই বিকারগুলি সম্ভব হয় (*i. e.* The shapes

or modifications proceed from the assumed parts of the সৎ—assumed by our intellect)। কিন্তু পরমার্থদৃষ্টিতে, এই ইদং-বুদ্ধির ফলেও সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুই সত্য বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। আমাদের বুদ্ধি যেমন মৃত্তিকাকে ঘট ও শরীর বলিয়া ধরিয়া লয় ; অথবা যেমন আমাদের বুদ্ধি রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে করিয়া লয় ;— এইরূপ, বুদ্ধি এক সদ্বস্তুকেই বিবিধ বিকারী বস্তু বলিয়া মনে করে।” এস্থলে এই মৃত্তিকা ও ঘটের দৃষ্টান্তটী পরিণামবাদের দিক্ হইতে, এবং রজ্জু ও সর্পের দৃষ্টান্তটী বিবর্ত্তবাদের দিক্ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই স্থলেই শেষ নহে। শঙ্কর আরও বলিতেছেন যে,— "সাংসারিক লোকে এক সদ্বস্তকেই ভিন্ন ভিন্ন বিকার বলিয়া বোধ করিয়া থাকে,—ইহা বুদ্ধির স্বভাবে ঘটিয়া থাকে। যেমন বুদ্ধির প্রকৃতিবশতঃ লোক, মৃত্তিকাকে ‘ঘট’ ও ‘পিণ্ড’ শব্দে ব্যবহার করে ; যেমন বুদ্ধির দোষে রজ্জুকে সর্পবোধে ‘সর্প’ শব্দে ব্যবহার করে ; কিন্তু যেমন পরমার্থদর্শী-লোকের নিকটে (যিনি জানেন যে ঘট প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকাব্যতীত কিছু নহে), সেই ঘট-বোধ ও ঘট-শব্দ উভয়ই নিবৃত্ত হয় ;—অথবা যেমন রজ্জুর যাঁহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার নিকটে সেই সর্প-বোধ ও সর্প-শব্দ উভয়ই নিবৃত্ত হইয়া যায় ;—এই প্রকারে প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর পক্ষেও, বিকার-বোধ ও বিকার-শব্দ উভয়ই চলিয়া যায়।”

আমরা এই ভাষ্যে সুস্পষ্টভাবে, দুই স্থানেই পরিণামবাদ অবলম্বনে দুইটী দৃষ্টান্ত ও বিবর্ত্তবাদ অবলম্বনে দুইটী দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। ইহা হইতে শঙ্করের প্রকৃত অভিপ্রায় বাহির হইয়া পড়িতেছে তিনি দুই প্রকার বাদে এই আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। আরো একটী গুরুতর কথা পাওয়া যাইতেছে। আমরা যে বিকারী দৃশ্যবর্গকে অনুভব করি, তাহা আমাদের বুদ্ধি ও বাক্যের (শব্দের) দোষে,—এ তত্ত্বও শঙ্কর জানিতেন।

চিৎসত্তা নিত্য একরূপ। ইহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত। ইহার কোন বিকার নাই, ইহা অখণ্ড। এই চিৎসত্তাই আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির স্বভাব-বশতঃ, বিকারী, খণ্ড-খণ্ডরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক অবিকৃত, অখণ্ড চিৎসত্তাই আমাদের বুদ্ধির সম্মুখে, শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়াকারে,—বিকারী জগৎরূপে—প্রতিভাত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে চিৎসত্তা, দেশ-কালাদি দ্বারা বিভক্ত নহে। কিন্তু বুদ্ধি, এই সত্তাকে দেশকালাদি দ্বারা বিভক্ত বলিয়াই অনুভব করে। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির পথে, শব্দস্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি নিয়ত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে। বুদ্ধি এইরূপেই জগৎকে অনুভব করে। বিজ্ঞানটী যে নিত্য, অখণ্ড, অবিকারী —বুদ্ধি তাহা ভুলিয়া যায়। বুদ্ধি এই প্রকারেই বিষয়বর্গের উপলব্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থদর্শীরা বুঝিতে পারেন যে, বিষয়েন্দ্রিয় যোগে এই যে বুদ্ধির বিবিধ বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, এগুলি বুদ্ধিরই বিকারমাত্র। এই সকল বিকারের মূলে এক বিজ্ঞান বা চিৎসত্তা অবস্থিত। সে বিজ্ঞানসত্তা দেশ-কালে বিভক্ত নহে। বুদ্ধি, সেই বিজ্ঞান-সত্তাকে আপনার বিকারগুলির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়া, এক অখণ্ড বিজ্ঞানকেই খণ্ডখণ্ড বিজ্ঞানরূপে—অনুভব করিতেছে। এইজন্যই, এক নিত্য বিজ্ঞানসত্তাই, বুদ্ধির নিকটে বিবিধ বিজ্ঞানরূপে,—শব্দ:

স্পর্শ-ভয়ক্রোধাদি বিজ্ঞানরূপে—বিষয়বর্গরূপে—প্রতিভাত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনুন্—

"আত্মনঃ স্বরূপং জ্ঞপ্তির্ণ ততো ব্যতিরিচ্যতে। অতো নিত্যৈব।
তথাপি বুদ্ধে রূপাধিলক্ষণায়াঃ, চক্ষুরাদিদ্বারেণ বিষয়াকারেণ
পরিণামিণাঃ, যে শব্দাদ্যাকারাভাষাঃ তে আত্মবিজ্ঞানস্য
বিষয়ভূতা উৎপদ্যমানা এব আত্মবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা
উৎপদ্যন্তে। তস্মাদ্বিজ্ঞানশব্দবাচ্যাঃ...বিক্রিয়ারূপা
ইত্যবিবেকিভিঃ পরিকল্প্যন্তে (তৈ০ ভাষ্য০)।"

ইহাই আমাদের বুদ্ধির সংসার-দর্শন। বুদ্ধি এই প্রকারেই এক অবিকারী আত্ম-সত্তাকে খণ্ডখণ্ড সত্তারূপে দর্শন করে;—এক অখণ্ড বিজ্ঞানকে শব্দস্পর্শরক্তলতা-সুখ-ভয়াদি বিজ্ঞান-রূপে উপলব্ধি করে,—এক চিৎসত্তাকে বিবিধ দৃশ্যরূপে—জগৎরূপে—দেখে।

"সত এব ইদং শব্দ-বুদ্ধি-বিষয়তয়া অবস্থানাৎ (ছা০ ভাষ্য০)"।

প্রকৃতপক্ষে চিৎসত্তা, এক ও অখণ্ড ও কার্য্য-কারণাতীত।

"তৎতু ন কারণান্তর-সব্যপেক্ষং নিত্যস্বরূপত্বাৎ;
সর্ব্বভাবানাঞ্চ চেতনাবিভক্ত দেশকালত্বাৎ, কালাকাশাদি-কারণত্বাৎ"।

ইহা দেশ-কালে বিভক্ত নহে। বুদ্ধির স্বভাবই এই যে, ইহা কোন বস্তুকেই দেশ-কালে বিভক্ত না করিয়া, কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলে না বাঁধিয়া অনুভব করিতে পারে না। গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে, আমাদের বুদ্ধি থাকে না, লীন হইয়া যায়। সুতরাং তখন খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞানের বোধও থাকে না। তখন চিৎসত্তার অখণ্ড বোধটী জাগিয়া উঠে। তখন সংসার থাকে না।

'বিবর্ত্তবাদে' এক অখণ্ড সত্তাই নিত্য। 'পরিণামবাদে'—বুদ্ধি যে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিষয়-বর্গকে দেখে, তাহাও ব্যবহারিক ভাবে সত্য। বেদান্তে এই দুই ভাবই অবলম্বিত হইয়াছে। উভয়ে উভয়ের বিরোধী নহে। পরিণাম-বাদকে রাখিয়াই, বেদান্তে বিবর্ত্তবাদের প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। অনেকেই এই তত্ত্বটী লক্ষ্য করিয়া দেখেন না। লক্ষ্য না করিয়াই শঙ্করাচার্য্যের দোষ কীর্ত্তন করেন।

বুদ্ধি যেমন এক চিৎসত্তাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিষয়বর্গের অনুভব করে;—তদ্রূপ আবার এই বুদ্ধির মূলে অখণ্ড আত্মসত্তারও প্রতীতি হয়। শঙ্কর বলেন—"যদুপলভ্যং অস্তি, তৎসর্ব্বং বুদ্ধ্যারূঢ়ং বুদ্ধিবৃত্তিক্রোড়ীকৃতং সদা দৃশ্যতে প্রকাশ্যতে, তৎসাক্ষী আত্মা"। "আত্মনো ন বিকারিত্বং, বুদ্ধিবৎসাবয়বাভাবাৎ"। বুদ্ধি সাবয়ব। সুতরাং বিষয়েন্দ্রিয়-যোগে, বুদ্ধিই বিষয়ের আকার ধারণ করে। বুদ্ধি যখন যে আকার ধারণ করে, নির্ব্বিকার আত্মা তখনই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইজন্যই শঙ্কর সর্ব্বত্র বলিয়াছেন যে, 'বুদ্ধি-গুহা' ব্যতীত আর কোথাও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না। আত্মা নিত্য-বিজ্ঞানস্বরূপ। বুদ্ধির

যখন যে অবস্থান্তর বা বিজ্ঞান-গুলি উপস্থিত হয়, তখন তখন সকল বিজ্ঞানেরই মূলে সাক্ষী, নির্ব্বিকার আত্মা অবস্থিত থাকেন। তিনি বলিয়াছেন—

"অন্তর্মধ্যে শরীরস্য পুণ্ডরীকাকাশে (বুদ্ধি-গুহায়াং)
শুদ্ধঃ আত্মা, তমাত্মানং উপলভ্যন্তে"। ব্রহ্মণো-
হত্র চৈতন্য-স্বরূপেণ নিত্যাভিব্যক্তত্বাৎ…
সর্ব্ববুদ্ধিপ্রত্যয়কৃতদ্যোতনে ব্রহ্মপুরে মনসি
(মুণ্ডক-ভাষ্য)।"

যাহা অখণ্ড, নিত্য সর্ব্ববিকারাতীত,—আমাদের চিত্ত-স্পন্দনই তাহাকে বহু বিকাররূপে প্রদর্শন করায়। চিত্তস্পন্দনই জগৎ; চিত্তস্পন্দনই—যাবতীয় দৃশ্যবর্গ। পুনঃ পুনঃ শঙ্কর এ কথা বলিয়া দিয়াছেন। মাণ্ডুক্য-ভাষ্য—

"জাগ্রতে দৃশ্যাঃ…জীবচিত্তাব্যতিরিক্তাঃ,
চিত্তেক্ষণীয়ত্বাৎ।" "সর্ব্বং গ্রাহ্য-গ্রাহকবৎ চিত্তস্পন্দিত-
মেব দ্বয়ং। চিত্তং পরমার্থতঃ আত্মৈবেতি নির্ব্বিষয়ং"।

চিত্ত স্পন্দিত হইলেই, এক অখণ্ড মূল সত্তাকে বহু বস্তুরূপে উপস্থিত করে। মূলে কিন্তু এ চিত্ত আত্মা ব্যতীত কিছুই নহে।

আমাদের বুদ্ধিই যে অখণ্ড চিৎ-সত্তাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, দেশকালাদিশৃঙ্খলে বাঁধিয়া, সংসার দর্শন করায়,—এই মহাতত্ত্ব শঙ্কর অন্য এক ভাবে সুস্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়সমন্বিত 'জীবের' অভিব্যক্তি না হইয়াছিল, তত দিন 'নাম-রূপের' অভিব্যক্তির সম্ভব হয় নাই। এই যে আমরা সংসারে বিষয়বর্গকে বিশেষ 'নামে' ও বিশেষ 'রূপে' খণ্ড খণ্ড করিয়া উপলব্ধি করি, এ উপলব্ধি 'জীবই' করিয়া থাকে। জীবের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে নাম-রূপেরও বিভাগ হয় নাই। "শরীরে প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিঃ ইন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধিযুক্তঃ প্রজ্ঞাত্মা"। ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণের সহিত সংসর্গই "জীবাত্মা" নামে পরিচিত। এই জীব ব্যতীত নাম-রূপের বিভাগ হয় না।—ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত। স্থলটী দেখুন—"প্রাণে প্রজ্ঞাত্মনি পরা দেবতা নাম-রূপব্যাকরণায় জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিষ্টা। (ছা॰ ভা॰)।"

ছান্দোগ্যের ত্রিবৃৎপ্রকরণে এই মহাতত্ত্ব উল্লিখিত আছে। শঙ্করের ইহাই সিদ্ধান্ত যে জীবেরই মন-ইন্দ্রিয়,—এই অখণ্ড চিৎ-সত্তাকে, দেশ-কাল ও কার্য্য-কারণশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া খণ্ড খণ্ড বিষয়রূপে দর্শন করিয়া থাকে।*

আবার শঙ্কর ইহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়বর্গকে অন্তর্মুখ করিয়া, বুদ্ধি-

* "নহি সদাত্মদর্শিঃ দেশকাল নিমিত্ত ভদ। অমৃত। ত্রিসন্নিকৃৎপদ্যতে।—ছা॰ ভা॰। দেশ-কাল-কার্য্যকারণ যে Subjective; ইহারা যে মনেরই সম্পত্তি, এ আবিষ্কার শঙ্করই করিয়াছেন। ইউরোপে এ তত্ত্ব বোধ হয় Kant আবিষ্কার করেন।

বৃত্তির মূলে সেই চিৎ-সত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে। পরমার্থদর্শীরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমরা দেখিয়া আসিলাম, আমাদের বুদ্ধিই এক অখণ্ড চিৎ-বিজ্ঞানকে খণ্ডখণ্ডরূপে, বিষয়-বর্গের আকারে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। আবার, এই বুদ্ধিবৃত্তিরই মূলে আমরা অবিকারী চিৎ বিজ্ঞানেরও অনুভূতি লাভ করিতে পারি। কিন্তু কেবল যে বুদ্ধিবৃত্তিরই মূলে সাক্ষীস্বরূপ আত্মসত্তার অনুভব লাভ করা যায়, তাহা নহে। আত্মসত্তার এই প্রকার অনুভূতি মুখ্য ও প্রধান হইলেও, অন্য এক ভাবেও আমরা তাহা লাভ করিতে পারি। এই যে আমাদের সম্মুখে অনন্ত জগৎ প্রসারিত রহিয়াছে, আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, ইহা কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে দৃঢ় আবদ্ধ। এই কার্য্য-কারণ-শাসিত জগতে খণ্ড খণ্ড দৃশ্যবর্গেরই অনুভূতি লাভ করা যায়। জগতে অখণ্ড চিৎসত্তার অনুভূতি লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রকৃতই কি তাই? তবে কি প্রকৃতই জগতে ব্রহ্মবস্তুর কোন সন্ধান মিলিবে না? শঙ্করাচার্য্য এদিকেও আমাদিগকে হতাশ হইতে নিষেধ করিয়াছেন। জগতের এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করিয়াই, সকল কার্য্যের পরম মূল কারণে উপস্থিত হইয়া, নির্ব্বিকার পরম-কারণ ব্রহ্মবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, সে কথাও শঙ্কর বলিতে বিস্মৃত হন নাই *। কিন্তু জগতে এ ভাবে ব্রহ্মদর্শন গৌণ উপায় মাত্র। বুদ্ধিবৃত্তির মূলে আত্মদর্শনই একমাত্র মুখ্য উপায়। কার্য্য-কারণ-সূত্র অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে গৌণ-ভাবে জগতেও ব্রহ্মবস্তুর সন্ধান মিলিতে পারে, সে কথা এই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বলিব না। এ প্রবন্ধে কেবল মুখ্য উপায়টীর কথা বলিব।

উপরে যে সমালোচনা করা হইল, তদ্দ্বারা ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, চিত্ত যাহা দেখায়, তাহা দেশ-কালে বিভক্ত এবং কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু দৃশ্যবর্গের মূলে যে আত্মসত্তা অবস্থিত, তাহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত এবং তাহা পরতন্ত্র নহে, স্বতন্ত্র স্বাধীন।—

"দেশতঃ কালতঃ গুণতশ্চ অপরিচ্ছিন্নং বিভুং ··· শরীর-নিমিত্তক বিকার রহিতং" (কঠ° ভা°)।

"স্বতন্ত্রস্তু ইচ্ছামাত্রেণৈব মন আদি প্রবর্ত্তকত্বং" (কেন° ভা°)।

আমরা তাহা হইলে এত দূরে দেখিতে পাইতেছি যে, এক মূল অখণ্ড সত্তাকে আমাদের চিত্ত, খণ্ড খণ্ড ভাবে, বিকারী জগদাকারে উপস্থিত করিয়াছে। এই বিকারী জগতের ব্যবহারিক ও পরিণামী সত্তাকে কেহই অপলাপ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু বিকারী দৃশ্যবর্গের মূলে যে বিকারাতীত স্বতন্ত্র চেতন-সত্তা আছেন, পরমার্থদর্শিগণ—এই বিকারকে অবলম্বন করিয়াই, তাঁহারও অভ্যাস পাইয়া থাকেন। উভয় প্রকার দৃষ্টির মধ্যে কোনই বিরোধ নাই।

* কারণের অনুসন্ধান দুই প্রকারে করা যায়। এক, সুষুপ্তিতে ভিতরে প্রাণবীজের সন্ধান। অপর, বাহিরে, সকল কার্য্যের মূলে গিয়া অব্যক্ত প্রাণবীজের সন্ধান ত্রিবৃৎপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া।

একটী অজ্ঞানীর দৃষ্টি ; অপরটী জ্ঞানীর দৃষ্টি। আমাদের বুদ্ধিই এই উভয় প্রকার সত্তার সংবাদ জ্ঞাপন করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই বিকারী জগৎও যদি ব্যবহারিক ভাবে সত্য হইল, এবং পারমার্থিক ভাবে যদি বিকারের মূলগত আত্ম-সত্তাও সত্য হইল, তবে কি দুই সত্তাই একরূপ ? শঙ্করাচার্য্য এ সম্বন্ধেই বা কি বলিয়াছেন, এখন তাহাই দেখা যাউক।

শঙ্কর বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও বিকারী জগৎকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই, তথাপি বেদান্তে যে এই জগৎ-সৃষ্টির কথা আছে, বিকারবর্গের বিবরণ আছে,—এগুলির স্বতন্ত্র কোন উদ্দেশ্য নাই। এক অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বের একত্বের বোধ ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতিতে এই সৃষ্টিতত্ত্ব ও জগতের কথা বলা হইয়াছে। বিকার-বর্গ,—বিকারবর্গের মূল-গত ব্রহ্মবস্তুর দর্শন করাইবে বলিয়াই, কেবল এই উদ্দেশ্যেই, এই দৃশ্য জগৎ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন উদ্দেশ্য জগতের নাই।—

"শ্রূয়তে ব্রহ্মণো জগদাকার-পরিণামিত্বাদি, তৎ ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে।...... ন তু স্বতন্ত্রফলায় কল্প্যতে (বে° ভা°)।"

"ব্রহ্মস্বরূপাবগমায় আকাশাদ্যন্নময়ান্তং কার্য্যং প্রদর্শিতং (তৈ° ভা°)।"

অতএব, এই ব্যবহারিক জগৎ যদিও ব্যবহারিকভাবে সত্য, তথাপি উহা আপেক্ষিক ভাবে সত্য,—এ কথাটা মনুষ্যের সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য। যতদিন প্রকৃত বোধ না জন্মিতেছে, ততদিন এ জগৎ দৃঢ় সত্য। কিন্তু এই জগৎ, সেই প্রকৃত পরম-সত্য ব্রহ্মের বোধ উপস্থিত করিতেও সমর্থ,—এ কথাটা ভুলিলে চলিবে না। এ কথাটী ভুলিয়া গেলে, এই সংসারেই জীবকে বদ্ধ হইয়া পড়িতে হইবে। বিকারের মূলে বিকারাতীত ব্রহ্মসত্তার বোধ জন্মাইবার নিমিত্ত এ জগৎ ইন্দ্রিয়-পথে প্রসারিত রহিয়াছে। যখন সেই একত্ব-বোধ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন বুঝা যাইবে যে, সেই অদ্বয়, একত্ব বোধই প্রকৃত সত্য-বোধ। এ জগতের বোধ মিথ্যা। সেই বোধ বুঝাইয়া দিবে বলিয়াই এ জগৎ রহিয়াছে। নতুবা ইহার স্বতন্ত্র, স্বাধীন উদ্দেশ্য নাই। অতএব স্বতন্ত্র-ভাবে এ জগৎ মিথ্যা।

এক এবং বহু—উভয়ে তুল্যরূপে সত্য হইতে পারে না। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই জীবের উদ্দেশ্য ; সংসারে বদ্ধ হইয়া বস্তুরাশির ভোগই উদ্দেশ্য নহে। বহু—একত্বের বোধ জন্মাইয়া দিবে ; বহু—একত্বের দিকে শনৈঃ শনৈঃ লইয়া যাইবে ; ইহাই বহুর উদ্দেশ্য। অপর কোন স্বাধীন উদ্দেশ্য নাই। অতএব এ ভাবে 'বহু' সত্য হইতে পারে না। যদি দৃশ্যবর্গ মূল একত্বের তত্ত্ব না ফুটাইতে পারে, তাহা হইলে এ দৃশ্যবর্গ মিথ্যা। অখণ্ডের তত্ত্বে লইয়া যাইবে বলিয়াই আমাদের বুদ্ধি জগৎকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখাইতেছে। যদি সেই অখণ্ড বোধে না লইয়া যাইতে পারিল, তবে ত দৃশ্যবর্গ ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহা না পারিলে, সংসারের দৃশ্যবর্গ ব্যবহারিক ভাবে সত্য হইলেও, প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা, অলীক, ব্যর্থ হইয়া উঠিবে। এই জন্যই

শঙ্কর বলিয়াছেন—"একত্ব মেবৈকং পারমার্থিকং দর্শয়তি মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতঞ্চ নানাত্বং"।—তত্ত্বদর্শীর পক্ষে এই ধারণা হওয়াই উচিত।

এই ভাবে বেদান্তে জগৎকে অসত্য বলা হইয়াছে। এই ভাবেই শঙ্কর বলিয়াছেন যে, একটী শব্দ বা অক্ষর লিখিতে যে সকল রেখা ব্যবহৃত হয়, সে রেখাগুলি অলীক, উহারা চিহ্ন মাত্র। কিন্তু এই রেখা দ্বারাই ত সত্য অক্ষরের বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রেখার নিজের কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং অসত্য। কিন্তু অক্ষরবোধ জন্মানই রেখার প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য সাধিত করিতে পারিলেই, রেখার সার্থকতা। জগৎ যদি জগতের অন্তরালবর্ত্তী আত্ম-তত্ত্বের বোধ ফুটাইতে সমর্থ হয়, তবেই জগতের সার্থকতা। নতুবা, এ জগৎ সেই রেখার মতই ব্যর্থ ও অলীক হইয়া পড়িবে। এই তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া শঙ্কর একটী বড়ই মূল্যবান্ তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম--এই তিনটীকে শঙ্কর, আমাদের "হৃদয়-গ্রন্থি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে অবিদ্যা গ্রন্থিটী সেই অদ্বিতীয় বিকারাতীত আত্মতত্ত্বকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ইহারই প্রভাবে আমরা নিয়ত বহির্মুখ রহিয়া, এক সত্তাকে অনন্ত খণ্ড খণ্ড সত্তারূপে দেখিয়া থাকি। 'কাম' নামক গ্রন্থিটী আমাদিগকে আত্মসুখপরায়ণ ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। ইহারই প্রভাবে, যাহাতে আপনার সুখ হয়, আপনার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয়, তজ্জন্য লালায়িত হইয়া, পরকে বঞ্চিত করিতেছি;—পরের সুখ কাড়িয়া লইতেছি। 'কর্ম্ম' গ্রন্থিও আমাদিগকে বহির্মুখ করিয়াছে। ঐন্দ্রিয়িক তৃপ্তির উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়া আমরা অহরহঃ পর-পীড়াদি কর্ম্মে ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছি। শঙ্কর বলেন যে, ইহাই আমাদের স্বাভাবিক সংসারাবস্থা! সংসারাবদ্ধ জীব আত্মদর্শনে বঞ্চিত। আত্মা ব্যতীত তাবৎ বস্তুই অনাত্মা! এই অনাত্মদর্শনই আমাদের স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে; 'হৃদয়-গ্রন্থি'র প্রভাবেই আমাদের এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। এই গুরুতর তত্ত্বটী শঙ্কর এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

"স্বাভাবিকং অনাত্মদর্শনং। তদাত্মদর্শনস্য প্রতিবন্ধকারণং—অবিদ্যা। যা চ পরাক্ এব অবিদ্যোপ প্রদর্শিতেষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু তৃষ্ণা (কামঃ), তাভ্যাং অবিদ্যা-তৃষ্ণাভ্যাং প্রতি-বদ্ধাত্মদর্শনাঃ বহির্গতানেব বিষয়ান্ অনুযান্তি বালাঃ। তে তেন কারণেন অবিদ্যাকামকর্ম্ম-সমুদায়স্য পাশং ··· ... প্রতিপদ্যন্তে (কঠ॰ ভা॰)॥

এই প্রকারে আমাদের এই যে সংসারে বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহার, ইহা মনেরই অধীন।—"বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহারস্য মনোঽধীনত্বাৎ" (কঠ॰ ভা॰)।

শঙ্কর অতি স্পষ্টভাবে এইরূপে আমাদের মনই যে সংসার-ব্যবহারের মূল, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আবার তিনি সঙ্গে সঙ্গে আর একটী মূল্যবান্ তত্ত্বেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে—মনই যেমন সমুদয় সংসার-ব্যবহারের মূল, তদ্রূপ মনেরই মূলে আত্মতত্ত্বের অনুভবও হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আত্মদর্শনের অন্য উপায় নাই*। শঙ্কর এই মহান্ তত্ত্বটীর এই

* সর্ব্ববিকল্পাস্পদো নির্বিকল্পঃ অত্রামেব 'গুহায়াং অধিগন্তব্যঃ। ন হি অন্যত্র উপলভ্যতে ব্রহ্ম—তৈ॰ ভা॰

প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—আমাদের "হৃদয় গুহাকে" তিনি 'ব্রহ্ম-পুর' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই হৃদয়-গুহায়, বুদ্ধির সকল প্রকার প্রত্যয়ের বা বিজ্ঞানের সাক্ষীরূপে আত্মার অনুভব করিতে হইবে।—"সর্ব্ব প্রত্যয়দর্শী চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্রঃ প্রত্যয়ৈরেব প্রত্যয়েষু অবিশিষ্টতয়া লক্ষ্যতে, নান্যৎদ্বার-মন্তরাত্মনো বিজ্ঞানায়" (কঠ০ ভা০)।

এই যে বিষয়েন্দ্রিয়-যোগে বুদ্ধির শব্দ-স্পর্শাদি বিবিধ বিজ্ঞান সর্ব্বদা উপজাত হইতেছে, আত্ম-চৈতন্য এই সকল বিজ্ঞানের সাক্ষী। আবার এই যে অন্তরে বুদ্ধির হর্ষশোকভয়-লজ্জাদি বিবিধ বিজ্ঞান জন্মিতেছে, এ সকলেরও দ্রষ্টা আত্ম-চৈতন্য। ইহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে। বুদ্ধি জড়; আত্মা চেতন। আত্মা এ সকল হইতে স্বতন্ত্র; অথচ আত্মা এ সকলেরই মূলে ইহাদের সাক্ষীরূপে অনুভূত হইতেছেন। তিনিই বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকার বিকারের দ্রষ্টা। তিনি বুদ্ধির খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞানগুলির মূলে,—সুতরাং তিনি বিজ্ঞান-স্বরূপ।

তিনি বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকার শোক-সুখ-হর্ষ-প্রীতি প্রভৃতির মূলে;—সুতরাং তিনি রসস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ। আবার, বুদ্ধির ইচ্ছার প্রভাবে, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল কর্ম্ম আমরা সম্পাদন করিয়া থাকি, আত্মাই সেই সকল কর্ম্মের মূলে উহাদের নিত্য স্বাধীন প্রেরয়িতা। এই প্রকারে, বুদ্ধি-গুহায়, আত্মার প্রকৃত স্বরূপটী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কেবল এইরূপেই বুদ্ধিগুহায় আত্মার বিকারাতীত স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারা যায়। অজ্ঞ, সংসার-বদ্ধ জীব যেমন "হৃদয়-গ্রন্থি" দ্বারা ব্যবহারিক জগতের বোধ লাভ করিয়া তাহাতে বদ্ধ হইয়া পড়ে; পরমার্থদর্শিগণ তেমনি আপনার "হৃদয়-গুহায়" আত্মবস্তুর সন্ধান পান। আমাদের বুদ্ধিই এই উভয় প্রকার বোধের দ্বার। এই দ্বিবিধ বোধের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। একে অপরের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। আমাদের বুদ্ধিই (Intellect) যেমন সংসারে খণ্ড খণ্ড কার্য্যবর্গের বোধ লইয়া, ইন্দ্রিয়-ভোগের উদ্দেশ্যে, সাংসারিক ক্রিয়ায় ব্যাপৃত রহিয়াছে; আবার তদ্রূপ আমাদের বুদ্ধিই (Reason) সকল বিকারের মূলে, সকল কার্য্যের অন্তরালে, বিকারাতীত সচ্চিদানন্দ আত্ম-বস্তুর সন্ধান বলিয়া দিতেছে †।

ইহাই প্রকৃত বোধ। এই বোধে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বুদ্ধি এই সংসারের অনুভব করিয়া থাকে। সংসারের এই উদ্দেশ্যই প্রকৃত মহান্ উদ্দেশ্য। কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য এ সংসার নহে। সে ভাবে এ সংসার মিথ্যা, অসত্য। বেদান্তদর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। শঙ্করাচার্য্য জীবনব্যাপী সাধনায় এই মহান্ তত্ত্বেরই আবিষ্কার করিয়াছেন। ওঁ তৎসৎ।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী

* লৌকিকঃ আনন্দঃ ব্রহ্মানন্দস্যৈব মাত্রা। কিন্তু বিষয়ি সম্বন্ধবশাৎ অনবস্থিতঃ লৌকিকং সম্পদ্যতে। ছা° ভা°

† এতৈর্হি চক্ষুঃ শ্রোত্রসাধনঃ প্রাবৈর্হিনু র্বধ্যবুদ্ধৈর্ন্নবশো হার্দ্দাধ্যপ্রাপ্তিবিরোধি কদাচি ... ... ন হার্দ্দে বধাপি সমভিধ্যতি (ছা০ ভা০)।